

# রিপলীনা


প্রথম প্রকাশক, ১লা বৈশাখ ১৩৬৬

প্রকাশক। রণজিৎ ঘোষ। ৬৮/২ বীরেন রায় রোড, পূর্ব। কলকাতা-৭

মূদ্রণ। ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস। ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ। শান্ত লাহিড়ী। নামাঙ্কন। বঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সবকারের আর্থিক সহযোগিতায় প্রকাশিত

# সূচীপত্র

'সময়ের কাছে সমুদ্রের কাছে'র অগ্রজ কবি রাম বসুকে-

অভিনয়ের জন্যে নাট্যকার অথবা সম্পাদকেব অনুমতির প্রয়োজন

'চার চোখ' ছাড়া বাংলা ভাষায় অন্যকোনো কাব্যনাটকের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে বলে অন্তত আমার জানা নেই। নাম করা বহু আধুনিক কবির কাব্য-সংকলনে কখনও কোনো কাব্যনাটক বা কাব্যধর্মী নাটক স্থান পেলেও গিরিশংকর, রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পত্রীর মতো অল্প কয়েকজন ছাড়া অন্য কারুর একক কোনো কাব্যনাটকের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলেও মনে হয় না। তাই দীর্ঘদিনের নিভৃত বাসনা ছিলো বাংলায় কাব্যনাটকের একটি সংকলন প্রকাশ করার। কিন্তু বাসনা থাকলেও এতদিন তা বাস্তবে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এর প্রথম কারণ প্রকাশক না পাওয়া। ব্যবসায়িক অসফলতার জন্যে আধুনিক বাংলা নাটকের প্রতিই প্রকাশকদের যখন অনীহার অন্ত নেই, কাব্যনাটকের প্রতি যে আদৌ থাকবে না সেটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় কারণ নির্বাচন। রেসিনের কথা বাদ দিলেও, আলেকসান্দর পুশকিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, তামাম দুনিয়া জুড়ে প্রকৃত অর্থে সার্থক কাব্যনাটক যখন গুটিকয়েক লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ, তখন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সার্থক কাব্যনাটক খোঁজার অর্থ সোনার হরিণেরই পেছনে ছোটার মতো।

তবু এই স্বীকারুক্তির পরিপেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই কয়েকটা প্রশ্ন উঁকি মারে—কাব্যনাটক কি, প্রকৃত অর্থে সার্থক কাব্যনাটক কোনগুলি, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংলাপ বা কাব্যধর্মী প্রায় শ'খানেক নাটক হাতে পাওয়া সত্ত্বেও তেমন করে সার্থক কাব্যনাটক নির্বাচনের অসুবিধেটা কোথায়, ইত্যাদি। তাত্ত্বিক কোনো বির্তকের মধ্যে না গিয়ে, গবেষকদের মতে সর্থক বাংলা কাব্যনাটক যখন তেমন করে নেই—সেটাই বাস্তব। আর সেই না-থাকার পটভূমিতেই আমাদের এই কাব্যনাট্য সংকলনের অসংলগ্ন পদসঞ্চার, যাতে অনাগত ভবিষ্যতে ত্রুটিমুক্ত সার্থক কাব্যনাটকের রক্তিম কোরকগুলো একদিন পরিপূর্ণভাবে নিজেদেরকে বাতাসে মেলে ধরতে পারে। এবং ঠিক একই কারণে, বিজ্ঞজনের মতে, তথাকথিত সার্থক কয়েকটি বিদেশী কাব্যনাটকে অনুবাদও পাশাপাশি তুলে ধরলাম, যাতে তুলনামূলকভাবে বাংলা কাব্যনাটিক-গুলোকে বিচার করার অবকাশ পাওয়া যায়।

যদিও স্পেনের কবি ও কাব্যনাট্যকার ফেদেরিকো গার্থিয়া লরকা নিঃসন্দেহে তুলনাবিহীন, তবু আধুনিক রুশ সাহিত্যের জনক আলেকসান্দর পুশকিনের 'জিপসি' এবং 'উপল অতিথি'-র চাইতে স্বার্থক কাব্যনাটক আর একটিও লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। উপরুক্ত কাব্যনাটকদুটি 'পুশকিনের রচনা সংকলন'-

এ প্রকাশিত হলেও, স্থানাভাবে তাঁর কোনো কাব্যনাটকই এই সংকলনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ঠিক যেমন সম্ভব হয়নি ককতো, বটমলে, জিমারমান, হোফম্যানস্থাল, ক্রাই কিংবা এলিয়টের কোনো কাব্যনাটক নেওয়া।

সংকলন গ্রন্থটি প্রসঙ্গে অকপটেই স্বীকার করে রাখি—এত স্বল্প পরিসরে সবাইকে যেমন স্থান দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়, তেমনি অনবধানে ভালো কোনো কাব্যনাটক দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। এবার সংকলিত কাব্যনাটক-গুলির ভালো-মন্দ বিচারের ভার পাঠক আর বোদ্ধাদের হাতে।

গগন দত্ত

## কাব্যনাট্যের স্বরূপ ও সমস্যা

আধুনিক জীবনের বহুবিচিত্র ঘটনা এবং ঘটনার অন্তরালে প্রবাহিত ভাবনা ও আবেগের নানাচারী স্রোতকে নাটকের সংক্ষিপ্ত ও সংহত মাধ্যমে বলিষ্ঠ রূপ দেবার প্রয়াসে গত কয়েক দশকে ইউরোপের নাটক রচনার ইতিহাস এক অস্থির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস। ন্যাচারালিজম্, এক্সপ্রেশানিজম্, সিম্বলিজম্, এপিক থিয়েটার প্রভৃতি বিভিন্ন অভিধায় চিহ্নিত নাট্যআন্দোলনের এক একটি পর্যায় প্রধানত নাট্য ঐতিহ্যের গতানুগতিক ধাবার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং যুগানুগ নতুন রূপ সন্ধানের ফলশ্রুতি। আধুনিক রঙ্গমঞ্চে কাব্যনাট্যের পুনস্থাপনার উদ্যোগ বিক্ষিপ্ত এবং বহুমুখী হলেও ইউরোপেব নবনাট্য আন্দোলনের ধারায় তা যে অন্যতম আকর্ষণীয় সংযোজন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং কাব্যনাট্যের স্বপক্ষে এই আন্দোলন- যদি আন্দোলন তাকে বলা যায়—মূলত ইয়েটস এবং এলিয়টের প্রণোদনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে তাঁদের সুচিন্তিত এবং প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতালব্ধ মতামতই এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে চলতি ধারণার নির্ধারক। স্পেনে লরকা এবং জার্মানীতে হোফমাস্থাল সার্থক কাব্যনাট্য লিখলেও কাব্যনাট্যের প্রকৃতি ও প্রকরণের ওপর কোনো আলোচনা তাঁরা লিপিবদ্ধ করেননি। একমাত্র ককৃতোই কাব্যনাট্যের স্বরূপের ওপর কিছু আলোকপাত করেছেন। ইয়েটস, এলিয়ট এবং ককৃতোর আলোচনা থেকে বিশিষ্ট নাট্যরূপ হিসাবে কাব্যনাট্যের উদ্দেশ্য ও নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা স্থির আদর্শকে তৈরি করা যায়। কিন্তু এই আদর্শে রচিত ভাষায়, নাটকীয়তায় ও মঞ্চপ্রয়োগে সর্বৈব সফল কাব্যনাট্যের সংখ্যা এতই কম যে কাব্যনাট্য কথাটির শিথিল ও বহুধা ব্যবহার এবং একই শিল্পরূপের ভার্স ড্রামা, ড্রামাটিক ভার্স, পোয়েটিক প্লে প্রভৃতি নানা নামের নৈরাজ্য বিশশতকের এই বিশিষ্ট নাট্যরূপকে অস্পষ্ট ধারণার কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত কাব্যনাট্যের যথাথ স্বরূপ সন্ধান এবং তার সার্থকতার সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্যতা এই প্রবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয়। বাংলায় কাব্যনাট্য রচনার যে উৎসুক প্রস্তুতি সম্প্রতি লক্ষণীয় তার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই এই আলোচনাকে প্রয়োজনীয় বলে আমার মনে হয়।

## দুই

কাব্যনাট্যের অনন্যতা এবং নাটকের অন্যান্য প্রচলিত রূপ থেকে তার শৈল্পিক বিশেষত্ব কোনো একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় আবদ্ধ করতে না পারলে এ সম্পর্কে আলোচনায় সহজে দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। কেবল প্রকরণের বিস্তারিত বিশ্লেষণে কাব্যনাট্যের লক্ষণকে পরিস্ফুট করা যাবে মাত্র এবং তাও কিছুটা বাগবিস্তারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। অন্যান্য নাট্যরূপ থেকে যে অনন্য চারিত্রে কাব্যনাট্য নাটকের বিশেষ শ্রেণী হিসাবে গণ্য হবার দাবী রাখে তা কয়েকটি লক্ষণের সমাহারে অভ্রান্তরূপে চিহ্নিত করা যাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে কাব্যনাট্যের স্বরূপ সম্পর্কে এই রকম কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ সুবোধ্য সংজ্ঞা নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। কাব্যনাট্যের আদর্শ নির্ধারণের যাঁরা পুরোধা তাঁরা সকলেই প্রায় প্রকরণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই একটা ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই বিশ্লেষণও প্রায়শই পুনরাবৃত্তির ঝোঁকে বার বার মূল লক্ষ্য থেকে সরে গেছে। তবু এই পথেই অগ্রসর হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কিন্তু, যেহেতু অন্তত চলনসই একটা সংজ্ঞাকে অবলম্বন না করলে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া কঠিন, তাই কাব্যনাট্যের স্বরূপ সন্ধানে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে আমি মেনে নিয়েছি এই সংজ্ঞাটিকে : "A play is poetic, when its concrete elements ( plot, agency, scene, speech, gesture ) continuously exhibit in their internal relationship those qualities of mutual coherence and illumination required of the words of a poem।" The Third voice—Denis Donoghue.

অর্থাৎ কাব্যনাট্যের গঠনগত রহস্য নিহিত রয়েছে ভাষা, ছন্দ, ঘটনা বিন্যাসের কোনো পৃথক উপাদানে নয়, তার নাটকীয় ও কাব্যিক সমগ্রতায়, যা ভাষা, চরিত্র, দৃশ্য, ঘটনাপ্রবাহ এবং দেহভঙ্গিমার পারস্পরিক পরিপূরকতায় ঘনসংবদ্ধ একটি অখণ্ড রূপকল্প। কবিতায় বিভিন্ন উপাদানের আঙ্গিক ঐক্য বা অরগানিক ইউনিটি সম্ভব হয় যে শক্তির প্রয়োগে সেই একই শক্তি যা দিব্যদৃষ্টি বা ইমাজিনেটিভ ভিসনের শক্তি, কাব্যনাট্যের কাব্যিক ও নাটকীয় বিভিন্ন অঙ্গকে একটি তীব্র একমুখী ঐক্যে গ্রথিত করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কাব্যনাট্যের মূল্য অন্বিষ্ট কাব্যিকতা ও নাটকীয়তার মিলন-বিন্দুকে আবিষ্কার এবং কবিতার গূঢ়সঞ্চারী ব্যঞ্জনা ও নাটকের সংঘাতমুখর গতিছন্দকে সুঠাম সংশ্লেষে সমন্বিত করা। কবির ব্যক্তিগত বিশ্ববীক্ষায় বিধৃত জীবনের

কোনো একটি বিশেষ উপলব্ধির ভিসন, ভাষা, চরিত্র ও অনিবার্য ঘটনাক্রমের পারস্পরিক প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত রূপকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয়। কবির ব্যক্তিগত জীবনদৃষ্টি এবং নাটকের নৈরাত্মসাধনার সার্থক সাযুজ্যই কাব্যনাট্যের প্রথম এবং প্রধান সিদ্ধি। "It must justify itself dramatically and not merely be fine poetry shaped into a dramatic form." Poetry and Drama—T. S. Eliot.

কবিতা ও নাটকের এই অর্ধনারীশ্বর রূপে কাব্যনাট্যের যে চারিত্র নির্দেশিত তাকে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে দুটি বিষয়ের স্বরূপ এবং সম্পর্কের প্রকৃতিকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যনাট্যের সম্ভাবনার আলোচনায় এই কাজটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

'কাব্যিক' কথাটির ব্যবহারে অতিব্যাপ্তি প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। এই একটি কথার সাহায্যে আমাদের বোঝাতে হয় কখনো নিছক পদ্যবন্ধকে, কখনো বিশেষ রোমান্টিক মনোভঙ্গীকে যা গদ্য বা পদ্য উভয় মাধ্যমেই ব্যক্ত হতে পারে, এবং কখনো ব্যক্তিক আবেগে স্পন্দিত গীতিকাব্যের সুরময়তাকে যা মুখ্যত কবিতা, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে গদ্যবন্ধকেও আশ্রয় করে ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'কাব্যিক' কথাটির অর্থের সীমাকে সুনির্দিষ্ট করে নিয়ে যদি তাকে অন্যান্য সমস্ত শিল্পের মতই একটি বিশেষ শিল্পপ্রক্রিয়া বা মোড অফ্ অ্যাপ্রিহেণ্ডিং রিয়ালিটি বলে স্বীকার করি, তাহলে কথাটিকে অর্থের অতিব্যাপ্তি থেকে উদ্ধার করে তার তাৎপর্যের বিশুদ্ধতাকে অনেকখানি রক্ষা করা যায়। কল্পনাশক্তি বা দিব্যদৃষ্টির একাগ্র পরিচালনায় ভাষা, ছন্দ ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবের অন্তর্ভেদী সত্যের যুগপৎ উপলব্ধি ও প্রকাশেই শিল্পপ্রক্রিয়া হিসাবে কাব্যের বৈশিষ্ট্য। নাটকের সংগে কবিতার সম্মিলনে কবিতা সৃষ্টির এই মৌলিক প্রক্রিয়া অক্ষুন্নই থাকে, কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে যে 'অরগানিক ইউনিটি' ভাষা, ছন্দ ও চিত্রকল্পের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের সূত্রে সমগ্র কবিতার তাৎপর্যে ক্রিয়াশীল কাব্যনাট্যে সেই 'অরগানিক ইউনিটি' কবিতার উপাদানের সঙ্গে নাটকীয় উপাদানের সুষম সংগতির ওপর নির্ভর করে। বলাবাহুল্য যে কবিতা ও নাটকের এই অঙ্গাঙ্গী সংযোগ দুরূহ তথা দুর্লভ এবং কবি-নাট্যকারের নিয়ত অনুসন্ধানের বস্তু, যেহেতু: "The writer of poetic drams is not merely a man skilled in two arts and skilful to weave them together; he is not a writer who can decorate a play with poetic language and

metre. His trsk is different from that of the dramatist or that of the poet, for his pattern is more complex and dimensional, The genuine poetic drama must, at its best, observe all the regulations of the plain drama, but will weave them organically into a much richer design." Introduction to 'The wheel of Fire'—T. S. Eliot.

কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ। কবিতা নির্মাণের এক একটি খণ্ডাংশ বা ইউনিট, তা একটি শব্দ হোক, পদ হোক বা চিত্রকল্প হোক, একান্তভাবে বাচনিক। কিন্তু নাটকের যে নির্মাণ তার খণ্ডাংশ কেবলমাত্র বাচনিক অংশেই সীমাবদ্ধ নয়। নাটকে এই খণ্ডাংশ এক একটি সিচুয়েশান, যার মধ্যে কুশীলবের কথা আছে, দেহভঙ্গিমা আছে, ঘটনাক্রমের একটি বিশেষ পর্যায় আছে, যেটি প্রতি-নিয়ত ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে ধাবিত হবার জন্যে উন্মুখ ও চঞ্চল এবং সমস্ত মিলিয়ে আছে মঞ্চের ওপর একটি জীবন্ত চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। এই সবগুলির সমবায়ে সৃষ্ট নাটকের এক একটি সিচুয়েশানকে সেই ভাবে নাট্যকার সাজান বা গেঁথে তোলেন, যাতে করে তিনি তাঁর বক্তব্য বা বিশেষ জীবন-উপলব্ধিকে বাস্তবের প্রতিভাসে মূর্ত করে তুলতে পারেন। সিচুয়েশানের এই সুনিপুণ বিন্যাসেরই নাটকের 'অরগানিক ইউনিটি'। কাব্যনাট্যেও নাটকের এই প্রাথমিক ঐক্যকে বজায় রাখতে হয়, তা না হলে কাব্যনাট্যের ঐ 'নাট্য, কথাটির কোনো সার্থকতা থাকে না। নাটকের অন্যান্য রূপ থেকে স্বতন্ত্র এক তাৎপর্যে উদ্দীপ্ত হলেও, কাব্যনাট্যেও যে এই নাটকীয়তা অপরিহার্য তা মনে রাখা দরকার। কিন্তু কাব্যনাট্যের স্বাতন্ত্র্য ও নাটকীয় গুণের সঙ্গে কাব্যগুণের সংযোগ এবং উভয়ের পরিণয়ে অন্যতর এক শিল্পরূপের সৃষ্টি, যা সমৃদ্ধ জটিলতায় অন্যান্য নাট্যরূপের তুলনায় অনেক উঁচুস্তরের। জটিল ও সমৃদ্ধ এই কারণে যে, সাধারণ নাটকের চেয়ে কাব্যনাট্য মানুষের অভিজ্ঞতার ইন্দ্রিয়গম্য, বুদ্ধিগম্য, মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক সমস্ত স্তরগুলিকে সংহত পরিসরে একই সঙ্গে সুতীব্র ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করতে সক্ষম। "It is in fact the privilege of dramatic poetry to be able to show us several planes of reality at once." The Aims of Poetic Drama—T. S. Eliot

এখানে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বাস্তবের এই বিভিন্ন স্তরের ব্যঞ্জনা কি গদ্যনাটকে আদৌ সম্ভব নয়? ইবসেনের 'দি ওয়াইল্ড ডাক' নাটকে কি আমরা ঠিক এই জিনিসটা পাই না? সম্ভব, এবং ইবসেনের উক্ত নাটকেও

বাস্তবের বিভিন্ন স্তরের সহ-অস্তিত্ব স্বীকার্য। কিন্তু গদ্যনাটকে এই স্তরবিভিন্নতা সচেতন, পূর্বনির্ধারিত এবং অনেকটা গণিতিক পদ্ধতিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিন্যস্ত। কাব্যনাট্যে কিন্তু এই একই ঘটনার ও মুহূর্তের বিভিন্ন ডায়মেনসনের ব্যঞ্জনা আনা হয় সচেতন ভাবে নয়, স্বতস্ফূর্তভাবে। সংলাপের মধ্যে ভাষাগত চিত্রকল্প এবং সিচুয়েশান-কেন্দ্রিক নাটকীয় চিত্রকল্পের দ্বৈত অভিঘাতে দর্শকের চেতনায় তার অজ্ঞাতসারেই বাস্তবের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন স্তরের দ্যোতনা বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে। কাব্যনাট্যের এই বিশেষ ক্ষমতার উৎস স্রষ্টার দিব্যদৃষ্টি এবং বাস্তবের গহনে নিহিত সত্যের নানাস্তরসঞ্চারী জটিলতাকে প্রায় ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার মতো তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতার মধ্যে। এই উপলব্ধি আবার কবি-নাট্যকারের বিশ্ববীক্ষা এবং জীবনদর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং একটি কাব্যনাট্যে নয় নাট্যকারের সমস্ত রচনাই তাঁর জীবন-উপলব্ধির এই তাৎক্ষণিক দীপ্তির ছটায় উদ্ভাসিত। কাব্যনাট্যের এই ব্যঞ্জনাশক্তি হয়তো প্রতীকী নাটকেরও আছে এবং অন্যান্য অনেক লক্ষণ সাদৃশ্যে কাব্যনাট্য থেকে প্রতীকী নাটককে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবু পার্থক্য একটা আছেই: **"It is possible that what distinguishes poetic drama form prosaic drams is a king of doubleness in the action, as if it took palce on two planes at once, In this it is different from ...symbolism (as in the plays of Materlinck) in which the tangible world is deliberately diminished."**

**Selected Essays—T. S. Eliot**

অর্থাৎ ব্যঞ্জনার পরিধিকে নানাস্তরে ব্যাপ্ত করা এবং দেশকালমুক্ত সর্বজনীনতায় তাকে অভিষিক্ত করার প্রয়োজনে প্রতীকী নাটক ঘটনা চরিত্র ও ভাষার পরিচিত বাস্তব রূপটিকে মুছে দেয়। কাব্যনাট্যের লক্ষ্য কিন্তু ভাষা, চরিত্র ও ঘটনার বাস্তবতাকে বিসর্জন না দিয়েও দৃশ্যমান বাস্তবের অন্তরালে নিগূঢ় স্তরের ব্যঞ্জনা আনা, ঘটনাক্রম এবং ভাষাগত চিত্রকল্পের যে প্যাটার্ণ তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে অন্য আর এক 'আণ্ডার প্যাটার্ণ' বা 'অন্ত-স্বরূপ' সৃষ্টি করে। এই 'অন্ত-স্বরূপ' সচেতনভাবে বোধগম্য নয়, কেননা তা কাব্যনাট্যের ভাষা, ছন্দ, চিত্রকল্প এবং সিচুয়েশান থেকে সিচুয়েশানে বিবর্তিত নাটকীয় চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে গোপনে গোপনে আমাদের অবচেতনায় কাজ করে যায়। এই 'অন্ত-স্বরূপ'কে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: **"It may be at the root of the**

**action and have the quality fo the myth, an archetypal pattern of human experience or ineffable vision of supernatural reality. It may emerge above the surface of life like action and reveal itseif as symbolism or allegory or may be submerged."**

**The Plays of T. S. Eliot—David Jones.**

যেভাবেই উপস্থাপিত হোক, এই 'অন্ত-স্বরূপ'-এর সৃষ্টিই দর্শক-মনের গহনে সূক্ষ্ম অথচ গভীর আলোড়ন তুলে তাকে বাস্তবের অন্তরালে অন্য আর এক গূঢ় সত্যের আস্বাদ এনে দেয়, আর এই মূল্যবান আস্বাদ আনার ক্ষমতাতেই কাব্যনাট্য নাটকের অন্যান্য সমস্ত রূপ থেকে পৃথক এক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত

## তিন

কাব্যনাট্যের লক্ষণগুলির আলোচনায় তার যে বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছি সেই অনুসারে কাব্যনাট্য বিচারের একটি মানদণ্ড তৈরি করে তা দিয়ে যদি কাব্যনাট্য নামে অভিহিত রচনাগুলির উৎকর্ষ এবং সাফল্যের পরিমাপ করা যায় তাহলে দেখা যাবে দেশী তো বটেই, বিদেশেরও অধিকাংশ রচনাই সার্থক কাব্যনাট্যের সমস্ত শর্তকে পূরণ করতে পারেনি। ইয়েটস, এলিয়ট ফ্রাই, সকলেই নিজের নিজের পদ্ধতিতে কাব্যনাট্যের সার্থকতার সমস্যাকে সমাধান করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সর্বৈব সাফল্য অর্জন করেছেন এটা তাঁরা নিজেরাও দাবী করতে কুণ্ঠিত। তাঁরা প্রত্যেকেই কাব্যনাট্যের কোনো একটি বিশেষ অঙ্গের সমস্যা সমাধানে ভাবিত। এলিয়ট যে তাঁর নিজের সৃষ্টিতে এখনও তৃপ্তি পাননি এবং 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' থেকে 'দি এল্ডার স্টেটসম্যান' পর্যন্ত তাঁর নাটক রচনার পরিক্রমা চূড়ান্ত উৎকর্ষের সন্ধানে যে এক একটি পদক্ষেপ একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন: "( Poetic **drama ) is an unattinable ideal : and that is why it interests me, for it provides me an incentive towards further experiment and exploration."** **Poetry and Drama—T. S. Eliot.**

এই আন্তরিকতা ও সৎসাহস নাটকের জগতে কাব্যনাট্যের যোগ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এলিয়টের অকৃত্রিম নিষ্ঠাকেই প্রমাণিত করে। ইয়েটস ও এলিয়ট কাব্যনাট্যের যে আদর্শকে সমনে রেখে কাব্যনাট্য রচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই আদর্শ নিজেদের সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ফলিত করে না তুলতে পারলেও এই

আদর্শে সার্থক কাব্যনাট্য যে একেবারে রচিত হয়নি এমন নয়। ফ্রানসিস ফারগুসন লরকার কাব্যনাট্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে এলিয়ট নির্ধারিত কাব্যনাট্যের আদর্শ অনুযায়ী একমাত্র সফল কাব্যনাট্য লরকার 'ডন পারলিম্পলিনের ভালোবাসা'। বৃদ্ধের তরুণী বিবাহ এবং প্রেমের জটিল যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অবশেষে মৃত্যুর মধ্যে প্রেমের প্রচণ্ড উপলব্ধি—স্পেনীয় লোকগাথার এই প্রাচীন বিষয়টিকে অবলম্বন করে লরকা ডন পারলিম্পলিন নাটকে কাব্যনাট্যের যে চরম সিদ্ধি অর্জন করেছেন তা নাটকের ভাষা, প্রতীক, চিত্রকল্প এবং দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ক্রমবিবর্তিত সিচুয়েশানের ঐক্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ফারগুসন দাবী করেছেন ডন পারলিম্পলিন এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য। ককতো কাব্যনাট্যের কাব্যাংশকে বলেছেন 'পোয়েট্রি অফ দি থিয়েটার' যা 'পোয়েট্রি ইন দি থিয়েটার' অর্থাৎ নিছক অলংকরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের এবং কাব্যনাট্যের অন্বিষ্ট এই 'পয়েট্রি অফ দি থিয়াটার':
**"Poetry in the theatre is a piece of lace which it is impossible to see at a distance. Poetry of theatre would be coarse lace, a lace of ropes, a ship at sea...the scenes are integrated like the words of a poem."** Preface de 1922

এই সূত্র অনুসারে লরকার নাটকটি আদর্শ কাব্যনাট্য, কারণ এইখানে ভাষায়, চিত্রকল্পে, কথ্যছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য রেখেও তার মধ্যে কবিতার অন্তঃসলিল নিগূঢ়তাকে সঞ্চারিত করা হয়েছে এবং প্রতি দৃশ্যের নিপুণ গাঁথুনি ও আভিনয়িক সজীবতায় নাটকটি গভীর জীবনবোধের একটি ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ রূপকল্প হয়ে উঠেছে। 'পয়েট্রি অফ দি থিয়েটার' এই নাটকে অত্যাশ্চর্য সফলতায় প্রতিষ্ঠিত।

## চার

সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যনাট্যের সম্ভাবনার প্রশ্নে এই 'পয়েট্রি অফ দি থিয়েটার'-এর প্রসঙ্গটি সবচেয়ে স্মরণীয় বলে মনে করি। কেননা বাংলা দেশে কাব্যিকতা বা 'পয়েট্রি ইন দি থিয়েটার'-এর দিকে প্রবণতা যতটা, নাটকীয়তার দিকে ঠিক ততটাই কম। একেই তো সাধারণভাবে আমাদের নাটকের ঐতিহ্য তেমন সবল পরিপুষ্ট নয়, তার ওপর কাব্যের আতিশয্য ঘটলে সেটুকুও বিড়ম্বিত হবার সম্ভাবনা। সামগ্রিকভাবে বাংলা নাটকের ক্ষীণ ঐতিহ্যের কথা মনে রাখলে কাব্যনাট্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা কিছুটা অলীক কল্পনা হয়ে পড়ে

তাছাড়া মঞ্চসফল কাব্যনাট্যের কোনো ঐতিহ্যই আমাদের নেই এবং তা নির্মাণের কোনো একাগ্র প্রচেষ্টাও হয়নি। তবে উপরে কাব্যনাট্যের বিভিন্ন লক্ষণের যে পর্যালোচনা করা হয়েছে তার আলোকে নাটকাকারে রচিত না হলেও মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যই কাব্যনাট্যের অধিকাংশ গুণে চিহ্নিত। সম্প্রতি কোনো এক সাহিত্যপত্রে শ্রীঅশ্রুকুমার শিকদার ভাষা এবং নাটকীয় পরিকল্পনার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যই এ যাবৎ বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য এবং একমাত্র মাইকেলের কবিপ্রতিভাই কাব্যনাট্য রচনার বিশেষ অনুকূল ছিলো। রবীন্দ্রনাথেরও কাব্যনাট্য আছে এবং নাটকীয় গুণের অভাব না থাকলেও সমগ্রভাবে সেগুলির আবেদন যতটা কাব্যিক ততটা নাটকীয় নয়, আব তার কারণ রবীন্দ্র প্রতিভার গীতিধর্মী বৈশিষ্ট্যে নিহিত। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, যেমন মালিনী এবং চিত্রাঙ্গদা, কিন্তু বিশিষ্ট নাট্যরূপ হিসাবে কাব্যনাট্যের যে সংজ্ঞাকে আমরা মেনে নিয়েছি সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী এ দুটি নাটককেও সার্থক কাব্যনাট্য বলতে দ্বিধা হয়। একমাত্র 'ডাকঘর' গদ্যে রচিত হলেও—যদিও সে গদ্য কথ্যভাষার স্বাচ্ছন্দ্য বাজায় রেখেও একান্তভাবে কবিতারই ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা—কাব্যনাট্যের সবচেয়ে কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে।

অতি সম্প্রতি কালে কাব্যনাট্য নামে যেগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলি না কাব্য, না নাটক—কোনোক্রমে দুটিকে মিলিয়ে একটা কিছু দাঁড় করানোর দায়িত্বহীন কৈশোরিক চাপল্য মাত্র। একমাত্র ব্যতিক্রম রাম বসুর কাব্যনাট্য গুলি, যদিও সেগুলি সর্বৈব সার্থক কাব্যনাট্য এমন কথা বলছি না। কারণ রাম বসুর কাব্যনাট্যেও কাব্যের তীব্র অভিঘাত যতটা মনকে নাড়া দেয়, নাটকীয় অভিঘাত ততটা অনুভব করা যায় না। তাছাড়া ভাষা, চিত্রকল্প, চরিত্রের দ্বন্দ্ব, সিচুয়েশানের গতিশীলতার এবং জীবনবোধের নেপথ্যচারী নিগূঢ় ব্যঞ্জনায় কাব্যনাট্যের অখণ্ড শিল্পরূপ এখনো তাঁর অনায়ত্ত। একটি বিশেষ নাট্য মুহূর্তের চূড়ায় উপনীত স্থিরপরিস্থিতিতে দু'তিনটি চরিত্রের মানসিক তরঙ্গের যে বিক্ষুব্ধ অভিব্যক্তি সেই ধারারই অনুসরণে রাম বসু যে একাংকিকা কাব্যনাট্যগুলি লিখেছেন তার মধ্যে সার্থক কাব্যনাট্যের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা যায়।

দিলীপ রায়

## ত্রিকোণমিতি

প্রযোজক : এনেছেন আপনার লেখা, পাণ্ডুলিপি ? কাব্যনাট্য বললেন আপনি এটা ? ছন্দে লেখা ? কি ছন্দ ? কেমন রাইমস্কীম ? অমিত্রাক্ষর ? অথবা গৈরিশ ? পড়বেন আপনি একদিন ক্লাবে এসে আপনার নাটক।

লেখক : আমার ছন্দ, প্রচলিত নিয়ম মানে না। এক্সপ্রয়েট করতে চাই কথোপকথনেব মধ্যে যে ছন্দ আছে—তাকে, আমরা এমন সুন্দর সহজ করে বলতে পারি কথা, মুখের কথার মধ্যেও যে সুর আছে, ধ্বনি আছে, তাকে আমরা আস্তে আস্তে ব্যবহার করতে পারি দৈনন্দিন কাজে ভাব প্রকাশের মাধ্যমে, ভাষাব আশ্চর্য যাদু, গানের মতন টঙ্কার, কৌশলে ভাষার ওপর আধিপত্য করলে জানা যায়; আমরা দেখতে শিখেছি ছাপার অক্ষরে ভাষা; আমরা তার প্রতিলিপি পড়ি মনে মনে চোখ বুলিয়ে গজদন্তের মতন মসৃণ কাগজে সুন্দর মুক্তার মতন ছাপার হরফে লেখা সৃষ্টি তখন যেন সার্থক মনে হয, সেই আত্মতৃপ্তির বাইবে নিয়ে যেতে চেয়েছি ভাষাকে নিতান্ত সাধারণ স্ল্যাং ও এমন উচ্চারণের ভঙ্গিতে অর্থপূর্ণ দীপ্য হয়ে উঠতে পারে যা রেখাপাত করতে পারে গভীর মনের মধ্যে যেন শাণিত ঝকঝকে অস্ত্র।

প্রকাশক : লেখা আছে ? লেখা ? নতুন ফসলের মতো টাটকা লাল আপেলের মতো সতেজ ঘ্রাণ ঝরে, দেখতেও টসটসে তাজা, এমন নতুন লেখা আছে ? বহু কাজ বাকি প্রেস, ছাপাখানা, যেখানে কম্পোজিটাররা ইলেকট্রিক আলোতে অন্ধকার দূর করে ছাপার কাজে ব্যস্ত সেখানে যেতে হবে এক্ষুণি দ্রুত।

লেখক : এরা সবাই ছুটে বেডায়, প্রতি মুহূর্তে যেখানে দামী। মূল্যবান সময় এদের অজস্র হীরার মতো যেন ঝরে পড়ে চারিদিকে; শুধু আমি একা, অনেক সময় কাছে নিয়ে বসে আছি, দেখছি স্ফুলিঙ্গ কত‌ই উড়ে যায় সময়ের বালুর ওপরে···

প্রযোজক : ইনটারেস্টিং; বলুন, শুনছি আপনার কথা; ওরা রিহার্সাল চালাচ্ছে, গ্রুপের সভ্যরা; ইতিমধ্যে শুনি আপনার বক্তব্য; আপনার নাটক কি অভিনয়ের উপযুক্ত ? না, শুধুই প্রকাশের জন্য লেখেন আপনি ?

লেখক : কাব্যনাট্য সম্পর্কে অশ্রুকুমার সিকদারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ; গদ্য নাটকের বাস্তবতা সীমাবদ্ধ ; যেন তা পূর্বপরিকল্পিত এক ছকে বাঁধা ; কিন্তু স্বীকার করবেন নিশ্চয়, জীবন এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন নয় . তাই এমন আঙ্গিক চাই, যাতে অবিশ্বাস্য, আশ্চর্য দিকটিও ধরা পড়ে ; বলছেন উনি ঐ প্রবন্ধে, "কাবনাট্যের সঙ্গে অন্য নাটকের পার্থক্য এইখানে, যে তাকে কাব্যের কষ্টিপাথরেও সার্থক হতে হয় ; কাব্যনাট্যের মধ্যে ঘটনা, গতি, উৎকণ্ঠা, চমৎকারিত্ব, বিস্ময়, প্রভৃতি নাটকীয় গুণ যেমন থাকবে, তেমনি ঘটনা চরিত্র ভাষাকে কেন্দ্র করে তারই মধ্যে দিয়ে একটি কেন্দ্রীয় তাৎপর্যও পুষ্পিত হবে কাব্যের মতো। কাব্যনাট্যে কবির ধারণা, তাঁর দিব্যদৃষ্টি, অনুভূতি, ধ্যান, জীবনের যথাসম্ভব বাস্তব চিত্র, বস্তু মরীচিকার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে অনুস্যূত।" তাই কাব্যনাট্যকে দুই হিসাবে সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হয়—একদিকে জীবনের নাটকীয় প্রতপ্ত জীবন্ত চিত্র হিসাবে, অন্যদিকে কবির দিব্য কল্পনার প্রতীক হিসাবে।

প্রযোজক : আমরা ড্রামা চাই, অভিনয় উপযোগী, মঞ্চে যা সফল ভাবে রূপায়িত হবে।

লেখক : নিশ্চয় ; আমারও উদ্দেশ্য তাই ; অভিনয়ে সাফল্য। তিনটি চরিত্র মাত্র, এক দুর্যোগের রাত্রে, যখন বৃষ্টিতে সারা সহর প্লাবিত

[ যবনিকা সরে গেলো, একটি ঘরে ওদের দেখা গেলো ]

অনুপম : এত বৃষ্টি, মনে হয় ডুবে যাবে সব, সৃষ্টি মুছে যাবে এমন বর্ষায় ; ওই শোনো বাজ পড়লো কোথায় ; যেন এক এটম বোমা ফাটলো আকাশে ; তুমি কথা বলছো না, কি ভাবছো, তুমি, রহস্যময়ী ? তোমার মনের মধ্যে কি আছে ? আমি যেন এক কাঁচের জানলার পাশে বসে আছি ; মনে হয় দেখতে পাচ্ছি সব বাইরে তোমার মুখ, কিন্তু হাত বাড়ালেই, ছুঁতে গেলেই, অনুভব করি হাত অবরুদ্ধ হয়ে যায় ওই কাঁচের জানলাতে ; তেমনি তোমাকে আমি মনে হয় এক একবার দেখছি, বুঝতে পারছি সবই, কিন্তু তারপর যখন আর একটু গভীরে যেতে চাই, প্রবেশ করতে চাই তোমার অন্তরে, দেখি তা রুদ্ধ ; তুমি কথা বলো ; চুপ করে থেকো না বাগানে সাজানো শ্বেত পাথরের নারী মূর্তির মতন।

শীলা : কি আর বলার আছে আমাদের আর ? তুমি, তুমি এতদিন প্রেমের ভাণ করে আমার সঙ্গে খেলা করেছো ; নষ্ট করেছো তুমি আমার জীবন ;

তুমি কি আমাকে ভেবেছিলে একটা পুতুল ? আমি একালের, সম্পূর্ণ রক্ত মাংস দিয়ে গড়া এক মেয়ে।

অনুপম : আগুন জ্বলছে, জানি তোমার দেহের ভিতরে ; বাসনার পাখা তাতে আরো উত্তপ্ত করে তোলে তোমার শরীর ; আমি প্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে নির্বাপিত করতে চেয়েছি সেই ভয়ানক আগুন : বিশ্বময় এতই দুঃখ ; এ সবের কারণ অসংখ্য অগণিত মানুষের জন্ম ; এই সব ক্ষুধার্ত পঙ্গপাল নিত্য জন্মাচ্ছে যারা, সেই হাংরিং জেনারেশন, তারাই একদিন মানুষের এত সাধের গড়া সভ্যতা, তাকে ভেঙে দেবে ; ধ্বংস করে দেবে ইতিহাস, আর্ট, কালচার, সবই ; সেই সব অগণিত হূণদের মতো, যারা ইনভেড করবে, এতদিন যারা ; এতদিন যারা ধীরে ধীরে রক্তক্ষয় করে সমাজ শৃঙ্খলা, আইন, এ সব প্রণয়ন করেছে, তাদের উৎস কোথা থেকে ? আমি বুঝতে পেরেছি, এই প্রবল ধ্বংসের বীজ লুকানো আছে কামনায়, স্থূল সেক্স-এ ; তাই আমি চাই না প্রাধান্য দিতে শরীরের দাবীকে ; আমি তাকে প্রেমে, উচ্চস্তরের এমন অন্য মানসিকতায় প্লাবিত, বঞ্চিত করে তুলতে চাই, যাতে সভ্যতা থাকবে, সব কিছু সুন্দরের অস্তিত্ব থাকবে, তোমাকে শোনাতে পারি গান, কবিতা ; জীবনে মানুষ কত কিছু শিল্পকর্ম করে, এ সব কেনই বা, কি তার উদ্দেশ্য ? শিল্প কি শুধু বাইরের জিনিস, শুধু কি তা নিয়ে খেলা করার জন্য এ সুন্দর সব সৃষ্টি হয়েছে ? শিল্পের ফাংকৃশন্ আমার মতে আসলে মানুষেব পশুত্বকে বিনাশ করা···

[ মিহিরের প্রবেশ ]

মিহির : বৃষ্টিতে ভিজে এলাম ; জল ঝরছে সর্বাঙ্গে ; বর্ষাতি বৃষ্টিস্নাত ; শুনতে পেলাম তোমার কথা ; মানি না তুমি যা বলো, মানুষ প্রকৃতির অংশ ; হয়তো আমাদের মধ্যে গাছ, পশু, ফুল সবই আছে ; আমরা চলি কথা বলি ; ভাষার রূপান্তর আস্তে আস্তে আবিষ্কার করেছি ; মাতৃভাষা ছাড়াও বলতে পারি বিদেশী ভাষাতে কথা ; ইংরিজীতে, কিংবা ফরাসীতে ; গাইতে পারি গান, আঁকতে পারি ছবি, চলচ্চিত্রে, নানা বিচিত্র সমস্যা নিয়ে মানুষের চরিত্র চিত্রণ দেখি, কিন্তু আমরা প্রাকৃতিক, সভ্যতা আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে না, যেখানে আমরা শুধুই সভ্য ; কেবল সংস্কৃতি দিয়ে গড়া মানুষ হতে পারে ? শুধুই সভ্য, আর কিছু নয় ?

শীলা : এমন একজন দেবতা, অথবা সন্ন্যাসী, অথবা নায়কের সন্ধান করতে চায় না কোনো মেয়ে ; জনসংখ্যার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাক রাষ্ট্রনায়কেরা, পলিটিশিয়ানরা, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবীরা ; আমরা প্রজাপতির মতন . জানি যৌবন চলে যাবে ; স্থির নয় রূপ ; তার আগে সম্পূর্ণ হতে চাই, সৃষ্টি করে যেতে চাই…

মিহির : তুমি আমার সঙ্গে চলো ; অনুপম, আমরা তোমাকে আগে বলিনি তোমার কল্পনা, তোমার মিথ ভেঙে দিয়ে আমরা দুজনে চলে যাবো ; বিরাট পৃথিবীতে নিশ্চয় আমাদের স্থান হবে , আমরা ভবিষ্যৎকে অঙ্ক দিয়ে, গণিতিক সংখ্যা দিয়ে অথবা দার্শনিকতা দিয়ে দেখিনি। আমরা মানুষ, সাধারণ জীব, এই মাত্র ; আর সব জীবের মতোই ধর্ম পালন করবো ; প্রয়োজন হলে, যুদ্ধ করে নেবো আমাদের অধিকার, আমাদের বার্থরাইট। তুমি এতদিন তোমার স্ত্রীকে নিষ্ফলা, বন্ধ্যা করে রেখেছো ; তুমি স্পিরিচুয়াল, কিসের সাধনা করো, তুমিই তা জানো , এমন আত্মকেন্দ্রিক মানুষের হাতে একজন মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা ; শীলা, তোমার স্ত্রী, আজ দুপুরে অফিসে আমাকে ফোন করেছিলো ; আমরা ঠিক করেছি, এখান থেকে চলে যাবো তোমার স্ত্রীকে, শীলাকে তোমার আশ্রয় থেকে আমি নিতে এসেছি , ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

প্রযোজক : ওই যে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে ড্রামা আছে, এইটুকু ভালো লাগলো ; কিন্তু কথা, বড় বেশি কথা ; সংলাপের ফুলঝুরি ফোটাচ্ছেন অথচ অ্যাকসন নেই, নেই ঘটনা, যাকে কেন্দ্র করে নাটক জমাতে পারি, আকৃষ্ট করতে পারি দর্শকদের চিত্ত

লেখক : কাব্যনাটকে ঘটনা গৌণ ; ঘটনার ভূমিকা এখানে যৎসামান্য। লক্ষ্য করে দেখবেন, আসলে জীবনেও ঘটনা ছোট্ট এক একটি স্ফুলিঙ্গ তুলে ধরে, তার ঘাত প্রতিঘাত আমাদের জীবনে তোলে তরঙ্গ . আমি তো আর হিন্দী চলচ্চিত্রে দারা সিং-এর ভূমিকা দেখাচ্ছি না, তাই এখানে, মানে কাব্যনাটকে, মল্লযুদ্ধ, অসিক্রীড়া এ সব না থাকতেও পারে ; হয়তো টেলিফোন বাজলো, কিংবা কেউ বৃষ্টিতে ভিজে এলো, অথবা এমন কোনো মনের গভীর থেকে উঠে আসা অর্থপূর্ণ এমন একটি সংলাপ, যাতে, একটি মেয়ের গলা থেকে বার হতে পারে এমন ছোট্ট একটু কথা, মনের মধ্যে ঝড় ওঠে, তা যেন বাজের আওয়াজকেও ছাপিয়ে যায়, একটু

গান, একটু কবিতা যা সিগনিফিকান্ট, তার ব্যবহার, সুষ্ঠ প্রয়োগ, যথাযথ পরিমিত যথাস্থানে, গানে সোমের মতো যেন তাল পড়ে, যেন এই বিরাট রহস্যময় অন্তর্জীবনের সমুদ্রে ঝড়ে ঢেউ ওঠে, সেইটুকু, সেই গূঢ় সংকেতটুকু ধরাই আমাদের কর্তব্য।

প্রযোজক : তারপর, তারপর কি হলো ? দেখা যাক, নায়ক নায়িকারা কি করে যবনিকা উত্তোলন করে।

[ পর্দা উঠলো ]

অনুপম : সত্যি, তুমি শীলা, আমার বিবাহিত পত্নী, অগ্নিসাক্ষী রেখে যেখানে আত্মায় মিলন হয়েছিলো, একদিনে তা ছিঁড়ে দিয়ে চলে যাবে তুমি ?

মিহির : তুমি ওকে বেঁধে রাখবে চিরকাল ? ও স্বাধীন, যদি তুমি জোর করো, আইনের সাহায্যে আমি মুক্ত করবো ওকে ; চিরকাল, এই এক আশ্চর্য ভূমিকা এক একজন মানুষকে পালন করতে হয়, বাইরে থেকে মনে হবে আমি এক ভিলেন, আমি নিষ্ঠুর, আমি সেই ত্রয়ীদের মধ্যে বর্বরতম, আমি, আমি আমার নিকট বন্ধুকে বিট্রে করেছি ; যেন আমি তীব্র যৌন আকর্ষণেই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছি, হয়তো আমি এই নিয়ে ভীষণ কাণ্ড করবো, কিন্তু ঈশ্বর জানেন আমার উদ্দেশ্য আসলে কি। আমি, আমি মুক্তি দাতা, আমি উদ্ধার কর্তা ; আমি দেখেছি চোখের সামনে একটি মেয়ে যেন এক পাখির মতন অসহায়, ডানা ঝাপটাচ্ছে উড়ে যেতে চাইছে আর একটি নীড়ে, যে বন্ধনে সে ইচ্ছায়, অথবা অন্য অনেক কারণে বাঁধা পড়েছিলো, তারপর সে তার ভুল বুঝলো, ছটফট করতে লাগলো সে তার শিঁকল ছিঁড়তে, আমি, আমি শুধু উপকারী বন্ধুর মতো এসে সেই শিকলটা খুলে দিচ্ছি, একে তুমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে শত্রুতা বলবে না, অথচ আমি ভালো করতে গিয়ে তোমার কাছে হবো বৈরী, এটাই কেমন যেন নাটকীয়।

অনুপম : মিহির, তোমার মনে ঈর্ষা জ্বলছে, ঈর্ষা, সেই গ্রীণ-আইড মনস্টার তোমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিলো, যেদিন প্রথম আমি নেহাৎ সারল্যে, তোমাকে আমার এই অসামান্য সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়েছি ; আমি ভাবিনি যে তুমি একদিন টেলিফোনে ওর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার জীবন ধ্বংস করে দেবে ; এরপর আমি যেন আগুনে পুড়ে ব্যারেন, নিষ্ফল হয়ে যাবো, আমি থাকবো, অথচ আমার জীবন শূন্য রক্তহীন হয়ে যাবে, অর্থহীন

হয়ে যাবে আমার অস্তিত্ব, আমার হাসি আনন্দ, আমার সংগ্রাম করার উদ্দেশ্য, সবই ম্লান, নিরর্থক পয়েন্টলেস হয়ে যাবে, এমন আঘাত, যেন পিস্তল থেকে গুলি ছুটে এসে আমাকে হঠাৎ মৃত করে দিলো, আর আমি এক ভূতের মতন বইবো বাকি জীবনের ভার ? অসহ্য অস্তিত্ব . আমি যদি সেই মানসিক মৃত্যু সইতে পারি, যদি তুমি, আমার বন্ধু, তুমি তা ঘটাও, তাহলে আমিও সহজে তোমাদের যেতে দেবো না ; এমন, এমন প্রতি-হিংসার উপায় খুঁজবো আমি, যাতে তোমরা কেউ আর সুখী হবে না, আমি ভেঙে দেবো তোমাদের স্বর্গে দরজা, আমি এমন শাপ দেবো, তোমাদেব স্বাধীনতা আর সত্যিকারের স্বপ্ন রইবে না।

শীলা : আমার কথা শুনবে না কেউ ; এতদিন আমরা মেয়েরা নীরব ছিলাম ; সমাজ যা করতো, বিবাহিত স্বামী মরে গেলে সহমরণে যাওয়ারও প্রথা ছিলো ; পৃথিবীতে মেয়েরা পুরুষের ছিলো পদানত ; পুরুষের গঠিত সমাজে মেয়েরা ছিলো নিজেব ইচ্ছেয়, সে কি কিছু কবতে পারতো ? সে ছিলো পুতুল, খেলার পুতুল ; এখন সে যুগ নেই। ক্রীতদাসীর মতন ; এমন কি বিবাহিত নারী, তারও, মেয়েরা এখন পুরুষেব সমকক্ষ ; আমি যে আসলে তোমার ক্রীড়ণক নই এইটুকু প্রমাণ করবার জন্যে আমি ওর সঙ্গে চলে যেতে চাই , আমি চাই একবার ফিল কবতে, যে আমিও স্বতন্ত্র , আমার নিজেরও এক অস্তিত্ব আছে তা ছাড়া, আদালতে প্রমাণ করাটা খুব শক্ত হবে না তুমি, তুমি···

মিহির : পুরুষত্বহীন ; আসলে তোমার এই বাইরের ছদ্মবেশ, এই উত্তম পুরুষের অভিনয়, এ সবই মিথ্যে, তুমি আসলে একটি মেয়েকে বশ করার অধিকারী নও।

অনুপম : আমাদের দুজনের মধ্যে, অই মিন টু বি একজাক্ট—আমাদের, আমাদের তিনজনের মধ্যে তাহলে কার অন্যায়টা বেশি, মনে হচ্ছে তুমি উদ্ধার কর্তা, তুমিই নায়ক এই নাটকের, আর আমি অপরাধী ? বেশ আমি বিনাযুদ্ধে ছেড়ে দিতে চাই না আমার প্রাপ্য, আমি টেলিফোন করছি থানায় পুলিশের কাছে।

প্রযোজক : আপনার ' লেখা শুনতে শুনতে মনে পড়লো, কোথায় যেন দেখেছিলাম একটি কবিতা ; প্রচলিত নিয়ম না মেনে যেটির পংক্তিগুলি যেন এক টেলিগ্রামের মতন সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ ; কবিতাটির কিছু কিছু

মনে পড়ে; "আঙুলের ইশারায় আকাশটা দেখিয়ে দিলো বিবি। তার নখে মেহেদী রঙ মাখা। সেই নখের নক্ষত্র রেখা লক্ষ্য করে আমি আকাশ না, খাঁচাটাকে বিষম দুলতে দেখলাম। খাঁচার পাখিটাও দুলছে। এই পাখির গলায় এখন গান নেই। সদা সর্বদা ডানা ঝটপট করে। ভয়ে কুঁকড়ে থাকে পালক ঠুকরে ফেলে নয়তো খাঁচায় তার বাঁকানো টুকটুকে ঠোঁটে চেপে ঠোকরায়। পালাতে চায়। কিংবা হা ঈশ্বর, হয়তো শুধুই সময় কাটায়। ঠোকরানোটাই তার স্বভাবে। আর কিছু নেই বলে শিক কামড়াচ্ছে। খাঁচায় কাগজ ছুঁড়ে দাও, তখন শিক ছেড়ে কাগজ-টাকেই ছিঁড়বে।"*

মিহির: দেখতে দেখতে সময় কেটে গেলো; দিনের পরে দিন বছর অতিবাহিত সময় চলে যায় নদীর স্রোতের প্রায়; বন্যার স্রোতের মধ্যে ঘূর্ণিপাকের ভিতর থেকে যেন তোমাকে নিয়ে এলাম এখানে। তোমাকে আমি চেয়েছি সুখী করতে; তবু, তবু আমার সেই মহৎ চেষ্টার বদলে আমি কি পেয়েছি? যে নারী দেহ ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, তা স্পর্শ করে, তার মধ্যে থেকে আমি খুঁজে পাবো পরম গভীর এক অর্থ, আবিষ্কার করতে পারবো সত্য, এই ছিলো আমার উদ্দেশ্য; যেন আমি লরেন্সের লেখার চরিত্র, দেহ থেকে, বাসনার তীব্র আকর্ষণ থেকে উদ্ধার করবো সোনা, এই ছিলো আমার সংকল্প; সবাই একই দিকে অন্বেষণ করে না; অনুপম সুন্দরকে খুঁজে-ছিলো শিল্প সংস্কৃতি, সেই দ্বিতীয় জগতের মধ্যে; সে চেয়েছিলো, আর্ট এ যে সুন্দর প্রতিফলিত, সেইটুকু, আয়নায় নির্মল ছবি ফুটে ওঠার মতো স্বচ্ছ এ্যাবস্ট্রাক্ট সত্য; আমি তাতে তৃপ্ত নই, আমি সেই মরীচিকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারিনি, আমি দেহের স্থূল আবেদনেও যে সত্য আছে, তা আরও বাস্তব, তাই চেয়েছি; এর জন্য বন্ধু স্ত্রীকে জীবন সঙ্গিণী করা ঘটনা চক্রে; এ্যাকসিডেণ্টাল; কিন্তু তবু মনে হয় একজনকে যেন তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছি।

শীলা: মনে পড়ে সেই রাত্রি, যেখানে, তোমরা যুদ্ধ করলে; সেই আদিম অরণ্যে যেখানে একটি মেয়েকে কেন্দ্র ক'রে দুটি পুরুষ যুদ্ধে একজন আর একজনকে পরাজিত না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হোতো না; সেটাই নিয়ম ছিলো; সেটাই স্বাভাবিক; কিন্তু এখন আমাদের মন শিক্ষিত; অনেক উচ্চস্তরে

* কবিতার মতো এই পংক্তিটির লেখক সন্তোষ কুমার ঘোষ।

আমরা উঠেছি; মানুষ হিসেবে তোমার বন্ধু অনুপম ভালো ছিলো। ভুলতে পারি না আমি তাকে।

মিহির : অনুপম তবু যেন ছায়ার মতন সারা জীবন আমাদের অনুসরণ করবে; অনুপম, নিতান্ত নিরীহ অনুপম এখানে নেই, শুধু সে ছিলো, তোমার জীবনে; তার কথা এখনও এখনও তুমি ভাবো, তোমার মনের মধ্যে আছে সে; তাহলে কি আমি শুধুই তোমার দেহ পেয়েছি? তোমার মন? তোমার মন আমি পারিনি নিতে।

শীলা: আমাকে তুমি মুক্তি দিতে চেয়েছিলে, সেই পাখিকে এখন ফের খাঁচায় বন্দী করতে চাও?

মিহির : বিবাহ-বিচ্ছেদ কতবার কতভাবে বিবাহিত নরনারীদের মধ্যে আসে, যায়। তারা বিবাহ-বিচ্ছেদ করে না, তারা মেনে নেয়।অন্য অনেক বিবেচনা; তারা কোনো ভাবে সেই বন্ধনের মধ্যেই থাকে, সাহস করে না সত্যি মুক্তি খুঁজে নিতে। বিস্ফোরক সেই স্বাধীনতা আমি তোমাকে দিলাম।

গিরিশংকর

# হীরেমন

এ নাটকের পটভূমি ধূসর। কোথাও সরু কালো ডোরা থাকতে পারে। এর বেশি অন্য কিছু পূর্বাহ্নে বলা সম্ভব নয়। জানলার কাছে চিবুকে হাত রেখে মমতা তাকিয়ে আছে দূর শূন্যতায়। পাখি এসে ঘরে ঢোকে।

পাখি : মা—মা মণি !

ওকি। চুপ করে জানালার কাছে বসে আছো কেন ? কি ভাবছো বলোতো ? কি এত ভাবো তুমি। বা রে—কথার উত্তর দিচ্ছো না যে ? মা ! মা মণি !

মমতা : আঃ। চুপ কর।

পাখি : কেন ? চুপ করবো কেন ? তোমাকে ডাকছি উত্তর দিচ্ছো না কেন ? শুনতে পাচ্ছো না বুঝি ?

মমতা : শুনতে পাচ্ছি বৈকি।

পাখি : তবে কেন উত্তর দিচ্ছো না ?

মমতা : শুনতে না পেলেই বোধ হয় ভালো হতো। দেখতে না পেলে বোধ হয় সুখী হতাম।

পাখি : তোমার ওসব হেঁয়ালি ভালো লাগে না। কি যে বলো তুমি আবোল তাবোল। কোনো মানে হয় না। নাও, এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো ওষুধটা খেয়ে নাও তো।

মমতা : এখন ওষুধ খাবো না।

পাখি : কেন। ওষুধ খাবে না কেন ? কাকু বলে গেছে ঠিক সাড়ে সাতটায় ওষুধ দিতে। কই—নাও ধর ওষুধটা।

মমতা : আঃ। তুই বড্ড বিরক্ত করিস পাখি। আমি ওষুধ খাবো না। তুই যা এখান থেকে।

পাখি : মাগো—তুমি রাগ করেছো।

মমতা : তুই যা আমার সামনে থেকে। চলে যা বলছি—

পাখি : না, যাবো না। তুমি সব সময় কেন আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চাও। তুমি একটুও ভালোবাস না আমাকে। বাবাকেও তুমি ভালোবাস না—আর আমাকে—

মমতা : পাখি—চুপ—

পাখি : না চুপ করবো না।

মমতা : তোকে কতদিন বারণ করেছি তোর বাবার কথা আমার সামনে বলবি না। তোর বাবা একটি অভদ্র অসভ্য জানোয়ার।

পাখি : মা!

মমতা : পাখি। এদিকে আয়। কাছে আয় আমার। শোন, তুই এখন আর ছোট্ট মেয়েটি নেই কত বড হয়ে গেছিস—বি, এ পাশ করেছিস। তোকে তো সব কথা আমি বলেছি।

পাখি : হ্যাঁ, সব কথা বলেছো। কিন্তু তোমার নিজের মতো করে বলেছো।

মমতা : নিজের মতো করে বলেছি?

পাখি : হ্যাঁ নিজের মতো করে।

মমতা : তুই কি বলতে চাস?

পাখি : আমি বলতে চাই তুমি বাবাকে কোনোদিন বুঝতে পারোনি।

মমতা : আমি বুঝতে পারিনি।

পাখি : না পারোনি। আর হয়তো বুঝতে চাওনি কোনোদিন -

মমতা : তার মানে তোর বাবা একজন মহাপুরুষ আর আমি—

পাখি : মহাপুরুষ নয়, একজন মানুষ। যাব দোষ আছে গুণ আছে—

মমতা : খুব লেকচার দিতে শিখেছিস—

পাখি : লেকচার নয়। যা সত্যি বলে মনে হয়েছে বলছি। তুমি শুধু বাবার দোষটাই দেখছো।

মমতা : আমারই ভুল হয়েছে। আমার উচিত হয়নি তোর বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া। আমি ভেবেছিলাম—অনেক দুঃখ পেয়েছে লোকটা, যদি দু দণ্ড মেয়ের সঙ্গে কথা বলে একটু শান্তি পায় তো পাক। তখন কে জানতো তোর মনটাকে এমনি করে আস্তে আস্তে বিষিয়ে তুলবে।

পাখি : তুমি নিজের দোষটা একেবারেই দেখতে পাও না—

মমতা : পাখি! তুই আমার সামনে থেকে চলে যা। শেষকালে রাগের মাথায় কিছু একটা করে বসবো আমি। আমি হয়তো নিজেকে

সামলাতে পারবো না।

পাখি : তুমি পাবো না নিজেকে সামলাতে। ভয়ানক একবোখা তুমি।

মমতা : ভয়ানক একরোখা না হলে এক কোঁটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে দাঁড়াতে পাবতাম না এই সংসাবে। কেউ কোনো সাহায্য করেনি। এক-কাপড়ে বেবিয়ে এসেছিলাম স্বামীর সংসাব ছেড়ে। কি করবো, কোথায় যাবো কিছুই জানতাম না।

পাখি : জানি বুকেব আড়াল কবে তুমি আমায় বাঁচিযে বেখেছো। কোনোদিন আমার কোনো অভাব বুঝতে পাবিনি, কোনো অভাব বুঝতে দাওনি।

মমতা : তুই ছাড়া আমাব তো আব কেউ নেই পাখি। তোব মুখেব দিকে তাকিয়েই সেদিন আমি সব কষ্ট সহ্য কবেছি। পাখি, তুই, তুই আমাব সব।

পাখি : আমি তোমাব পোষা পাখি—

মমতা : তুই আমাব হীবেমন। আমাব লক্ষ্মীসোনা। দে মা, ওষুধটা খাই। একটু জল দে। বড্ড তেতো ওষুটটা। কি বে, হাসছিস কেন মুখটিপে।

পাখি : দাও, ওষুধেব গেলাসটা দাও।

মমতা : হাসছিস কেন বললি না যে ?

পাখ : না বাপু আব শুনে কাজ নেই। তুমি হযতো আবাব বেগে যাবে।

মমতা : বল না কি হযেছে ?

পাখি : কাল বাবা এসেছিলো।

মমতা : কখন ?

পাখি : সন্ধ্যেব সময তুমি যখন ডাক্তাবেব কাছে গিযেছিলে। কাকু বাড়ি নেই

মমতা : তাবপব ?

পাখি : মা।

মমতা : কি হয়েছে বলবি তো ?

পাখি : আমি জানি বাবা তোমাব ওপব অন্যায কবেছে। খুব অন্যায়, কিন্তু তবু কেন আমার কষ্ট হয় বাবার জন্যে বলতো ?

মমতা : তোব কেন কষ্ট হয় কি করে বলবো ?

পাখি : আমার মনে হয বাবা তোমাকে ভয়ঙ্কর ভালোবাসে। না মা, চমকে উঠো না। আমার সত্যি মনে হয় তোমাকে বাবা ভয়ানক ভালোবাসে,

ভালোবাসতো। বোধ হয় চাইতো তোমাকে নিজের মনের মতো গড়ে তুলতে।

মমতা : তাই বুঝি চাবুক দিয়ে মেরে আমার পিঠে দাগ করে দিয়েছে। আমার পিঠেব দাগ আজো মেশায়নি পাখি।

পাখি : বাবাব বুকের দাগটাও মেলায়নি মা।

মমতা : আমাব পিঠের দাগটা যতদিন না মিলোচ্ছে কারুব বুকের দাগ নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না—। পাখি—আমি চাই না তুই আর তোর বাবাব সঙ্গে কোনো সম্পর্ক গড়ে তুলিস। তুই আবার যদি, আচ্ছা থাক, তোকে কিছু করতে হবে না, আমিই ওর এ বাড়িতে আসা বন্ধ করছি।

পাখি না—না। মা তুমি তা কোবো না।

মমতা কেন? তোব ভালো মন্দেব দায আমাব। আমি যা ভালো বুঝবো কববো।

পাখি : তাই বলে তুমি আমাব ঘবেব সব জানলাগুলো বন্ধ কবে অন্ধকারে দম আটকে মেরে ফেলবে নাকি?

মমতা তুই কি বলছিস।

পাখি বলছি। আমি বলছি—তুমি আমায় এত ভালোবেসো না।

মমতা পাখি!

পাখি না মা, আমি—আমাকে একটু আমাব মতো থাকতে দাও। তোমার সব কথা আমি মেনে নিয়েছি।

মমতা আমি যা কবছি তোব ভালোর জন্যে।

পাখি আমাকে এম এ পড়তে বারণ কবেছো—

মমতা দরকার কি মা!

পাখি বাইরে বেরুতে বারণ কবেছো -

মমতা মিছিমিছি কি হবে?

পাখি মিহিরকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছো—

মমতা তোর দায়িত্ব নেবাব ক্ষমতা ওর নেই।

পাখি এ সব তুমি আমার জন্তে করেছো?

মমতা তুই ছাড়া আমার আর কে আছে—কি আছে!

পাখি : তুমি যখন স্বামীর ঘর ছেড়ে এলে তখন ম্যাট্রিক পাশ করোনি, তারপর সারাদিন পরিশ্রম করে রাত্তির জেগে জেগে বছরের পর বছর দুই চোখের কোলে কালি ঢেলে বি-এ পাশ করেছে।

মমতা : তোর জন্যে পাখি—

পাখি : দুনিয়াটাকে চিনে নেবার জন্যে তোমার বাচ্চা হীরামনকে পাশের ঘরের ভাড়াটে বউএর কাছে জমা রেখে দিনরাত ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়েছো।

মমতা : আমার সব অভিজ্ঞতা তোকে দিয়ে যাবো।

পাখি : আর—আর তোমার দায়িত্ব নিতে অক্ষম একশ পাঁচ টাকা মাইনের সওদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি নিরঞ্জন সামন্তকে বেছে নিয়েছো তোমার বাকি জীবনের সহচর বলে।

মমতা : কেন, কেন বেছে নিয়েছি - তুই জানিস না ? তোকে বলিনি ?

পাখি : জানি। অনেকবার বলেছো।

মমতা : তবে। তবে কেন তুই এসব কথা বলছিস—পাখি।

পাখি : কেন বলছি জানি না। কোনোদিনও ভাবিনি তোমাকে এসব কথা বলবো।

মমতা : এসব কথা তোকে কে শিখিয়েছে, তোর বাবা ? মিহির ?

পাখি : আমি নিজে বুঝি কিছু ভাবতে পারি না ?

মমতা : মিহির কতদিন আসেনি রে ?

পাখি : হিসেব রাখিনি।

মমতা : না তবু—মানে কতদিন—

পাখি : মানে অনেক দিন। অনেক দিন। মা, আমি মিহিরের মুখ প্রায় ভুলে গেছি। ইচ্ছে করে মনে মনে ওর মুখের রেখার ওপর এলোমেলো অন্য রেখার দাগ বুলিয়ে বুলিয়ে ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট করে দিয়েছি। কিন্তু মা, কিছুতেই ওর ঠোঁটের কোণের হাসিটাকে মুছতে পারছি না, আর পারছি না ওর চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিটাকে নিভিয়ে দিতে— মা, মাগো !

মমতা : কাঁদিস না পাখি। আমাদের অনেক স্বপ্নই মুছে যায়।

পাখি : হ্যাঁ মা, আমার স্বপ্নও মুছে যাচ্ছে।

মমতা : পাখি। আমার হীরেমন।

পাখি : কাকুকে বলো না—তোমার নিরঞ্জন সামন্তকে, কাল শেয়ালদার বাজার থেকে একটা খাঁচা কিনে আনতে—বেশ লাল নীল রঙের ডোরা কাটা। তার মধ্যে তোমার হীরেমনকে পুষে রাখবে।

মমতা : পাখি তুই কেন অমন করে কথা বলছিস।

পাখি : মা, আমার খুব ইচ্ছে করে তোমার অবাধ্য হই।

মমতা : না রে পাখি, না—

পাখি : ইচ্ছে করে তোমার বাধা নিষেধ নিমেষে চুরমার করে ছুটে বেরিয়ে যাই। ইচ্ছে করে দুরন্ত বাতাসে আমার কোঁকড়া চুলগুলো উড়তে থাকুক—গত জন্মদিনে পাওয়া লাল শাড়ির আঁচলটা পতাকার মতো পত্ পত্ করে উড়ুক আমার পেছনে! আর আমি চোখ বুজে ছুটি, ছুটবার সময় আমার শরীরটা হালকা হয়ে যাক ভীষণ—দুটো মস্ত বড় সাদা ধব্ধবে পাখা গজাক আমার পিঠের ওপর তুমি—তুমি আর আমায় দেখতেই পাবে না, ছুঁতেই পাবে না, আমি তোমাকে ছেড়ে অনেক—অনেক দূরে চলে যাবো। মা—শুধু একটা আওয়াজ আমি শুনতে পাবো—শুধু একটা কণ্ঠস্বর আমার পেছনে বাতাসে চাবুকের মতো আওয়াজের শিস তুলবে। আমি কিছুতেই তার নাগাল ছাড়িয়ে যেতে পারবো না। কিছুতেই না—কিছুতেই না—ওই শোনো চাবুকের শিস বেজে উঠলো—ওই—

[ এই সময় ঘরের আলোটা স্বভাবতই ম্লান হয়ে আসবে। উইঙ্‌সের পাশ থেকে ঘরে আসবে মিহির। ]

মিহির : বাঃ, কি সুন্দর তোমাব চুলগুলো পাখিদি। কোঁকড়া কালো বাতাসে কি সুন্দর দোল খায়—

পাখি : অ্যাই দুষ্টু ছেলে! আমার চুলের অত ব্যাখ্যান করতে হবে না—

মিহির : মঙ্গলাচরণের সেই কবিতাটা জানো—

পাখি : কোন কবিতা?

মিহির : "ঘূর্ণি হাওয়ায় চুল উড়ছে, চুল উড়ছে জ্বালামুখী সাপ, চোখে তাদের প্রলয় পীততাপ…"

পাখি : না—জানি না, কবিতা জানতে চাই না।

মিহির : তুমি জানো না পাখিদি, কবিতা মানুষকে এমন এক উচ্চতায় তুলে

নিয়ে যায়—ও,তুমি হাসছো বুঝি? হেসো না, মানে আমাকে উপহাস করে তুমি হাসলে ভারি খারাপ লাগে—বড় কষ্ট হয়—

পাখি : আমি তোমাকে উপহাস করছি?

মিহির : আমার মনে তাই হয়। তুমি আমাকে প্রায়ই উপহাস করো—আঘাত দিতে চাও। হ্যাঁ, তুমি চাও আমি কষ্ট পাই—তাতে তোমার কি লাভ আমি জানি না।

পাখি : মিহির।

মিহির : বলো পাখিদি—

পাখি : আমার কাছে এসো। আরো সবে এসো—আরো—আরো।

মিহির : তোমার গায়ে কি সুন্দর গন্ধ।

পাখি : আমার কাঁধে হাত রাখো। আমাকে ডাকো—

মিহির : পা—খি—দি—

পাখি : না, পাখিদি নয়। বলো—পাখি। শুধু পাখি।

মিহির : পাখিদি—

পাখি : না, পাখি।

মিহির : তুমি আমায বলেছিলে পাখিদি বলতে।

পাখি : আমি তোমায় বলছি পাখি বলতে। বলো। বলো। বোকা ছেলে—তুমি কিচ্ছু জানো না—কিচ্ছু বোঝো না। পৃথিবীর কত বড বড় রাজনীতির সমস্ত জলের মতো বুঝতে পারো আর একটা মেয়ের কথা তোমার মাথায় ঢোকে না।

মিহির : না—আমি ঠিক বুঝিনি। আমায় তুমি অন্য রকম বুঝতে বলেছিলে। তোমায় প্রথম দিন দেখেই আমার এত ভালো লেগেছিলো।

পাখি : আমি তা জানি মিহির।

মিহির : তুমি জানতে?

পাখি : জানতাম। আর সেই ভয়ে চাইনি তোমার কাছে এগিয়ে যেতে—তোমার—

মিহির : কিসের ভয়?

পাখি : প্রথম ভয় নিজের। তারপর তোমার—

মিহির : নিজের ভয়?

পাখি : আমার জীবনে সুখ নেই।

মিহির : সে তো দুঃখবিলাস। আমি জানি—তুমি আমায় বলেছো। তোমার মা আর কাকু—তাতে তোমার কি—

পাখি : আমি আমার মার জীবনে অভিশাপ। আমি না থাকলে—

মিহির : আশ্চর্য সেন্টিমেন্টাল ! আমার ভয়টা কি—

পাখি : তোমার ভয় ?

মিহির : হ্যাঁ আমার ভয়—

পাখি : তোমার জীবনের স্বপ্নটা চুরমার হয়ে যাবে আমার কাছে এলে। কত বড় স্বপ্ন তোমার—তুমি কত বড় হবে, সারা দেশটা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে মিহির—

মিহির : হ্যাঁ—রাস্তায় দেখতে পাও না মানুষের সারি—নুয়ে নুয়ে চলেছে যেন মাথার ওপর বিরাট বোঝা। মুখের রেখাগুলো ক্লান্তি আর অবসাদে গভীর। চোখের কোলে দুশ্চিন্তার কালি মাখামাখি। এই মানুষগুলো যেন আখপেষাই যন্ত্রে চাপ খেয়ে খেয়ে ছিবড়ে হয়ে যাচ্ছে। আর শুধু কয়েকজন বড় লোকের সম্পদ আরো বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। এই অবস্থা চলতে পারে না—আর চলবে না। আমরা এই অবস্থাটা পালটে দিতে চাই। মানুষকে চাই সুস্থ আর স্বাধীনভাবে বাঁচবার অধিকার দিতে।

পাখি : সুস্থ আর স্বাধীন ?

মিহির : আমাদের দেশ নামে মাত্র স্বাধীন হয়েছে বটে—আজ উনিশ কুড়ি বছরের স্বাধীনতার এই তো বাহার। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, জীবিকার সংস্থান নেই, বেঁচে থাকবার কোনো গ্যারান্টি পর্যন্ত নেই। এই স্বাধীনতা আমরা চাই না—পাখি—

পাখি : মিহির—

মিহির : পাখি—

পাখি : তুমি আর এ বাড়িতে এসো না।

মিহির : পাখি—তুমি—তুমি—

[ দুজনে একটু সময় পরস্পরের দিকে তাকায় ]

আমি তোমায় ভালোবাসি পাখি

পাখি : মিহির তুমি বাড়ি যাও।

মিহির : তুমিও আমায় ভালোবাস। আমি—আমি বুঝি, তবু কেন তুমি··· তোমাকে আমার পাশে পেলে···

পাখি : না।

[ একটু স্তব্ধতা ]

তুমি যাও। চলে যাও। আর কোনো দিন এসো না আমার সামনে। আমার এই বোবা স্যাঁতস্যাতে জীবনে আলোর কোনো দরকার নেই। তুমি যাও, চলে যাও। শুনতে পাচ্ছো না, মিহির তুমি যাও। যাও।

[ মিহির মাথা নিচু করে বেরিয়ে যায়। আস্তে আস্তে আলোটা উজ্জ্বল হযে ওঠে ]

জানো মা ঐ বাতাসেব শিস আমাকে মাঝে মাঝে তাডা করে বেড়ায়।

মমতা : তুই মিহিবকে ভালোবাসিস পাখি? আমিও তোর বাবাকে ভালোবাসতাম।

পাখি : মা। আমার বড ক্লান্ত লাগছে।

মমতা : একটু গরম হরলিক্স খা। তুই বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছিস পাখি। শরীরের যত্ন কর—নইলে সারা জীবন ভুগবি আমার মতো।

পাখি : সারাটা জীবন বেঁচে থাকতে হবে—এই না?

মমতা : বাঁচতে হবে বৈকি মা।

পাখি : কি হবে বেঁচে।

মমতা : তা তো জানি না মা—

পাখি : মা—বাবাকে এ বাড়িতে থাকতে বলি আমাদের কাছে।

মমতা : তোর বাবাকে?

পাখি : হ্যাঁ মা। বাবা বড্ড রোগা হয়ে গেছে।

মমতা : আর তোর কাকু। তোর নিরঞ্জন সামন্ত?

পাখি : তাহলে আমি যাই বাবার কাছে—

মমতা : তা হয় না পাখি।

পাখি : বাবার কথা তুমি ভাবছো না।

মমতা : আমার তো ভাবার দায়িত্ব নেই। আর ভাবলেই বা আমি কি করতে পারি। নিরঞ্জন তো কোন দোষ করেনি—

পাখি : মা—তুমি, তোমার কি কখনো ইচ্ছে হয় না বাবার কাছে যেতে?

মমতা : ইচ্ছে হলেও উপায় নেই।

পাখি : উপায় নেই তাই না। তুমি একদিন উপায় না ভেবে বাবার সংসার থেকে চলে এসেছিলে—সেদিন তুমি উপায়ের কথা ভাবোনি। আজ ভাবছো। আজ আর তোমার উপায় নেই।

মমতা : আঃ পাখি। তুই আবার আমায় বিরক্ত করছিস। যা, তুই চলে যা আমার সামনে থেকে। দূর হয়ে যা।

পাখি : মা—মা মণি।

মমতা : আবার আদিখ্যেতা করছিস?

পাখি : উপায় নেই মা—উপায় নেই। তুমি আমি আমরা দুজনে নিরুপায়। আমাদের পায়ে লোহার আংটি পরানো। একটুখানি এদিক ওদিক সরে বসতে পারি—দু একবার ডানার ঝাপ্টানি তুলতে পারি—ব্যস্ ওইটুকুই—ওব বেশি নয়।

মমতা : পাখি—

পাখি : বলো মা—বলো হীরেমন—আমাব হীবেমন।

[ পাখি মমতার কোলে মুখ ডুবিয়ে দেয়। মমতা দু হাতে চেপে ধরে ওর মাথাটা কোলের ওপর ]

রাম বসু

## পাহাড়ের ডাক

[ বাড়িটা পাহাড়ের ঠিক ধারেই। কান পাতলে শোনা যায় অবিরাম ঝরনার শব্দ আর মাদলের আওয়াজ। চারপাশে বাগান। পরদা উঠলে দেখা যাবে স্টেজের মাঝখানে শমীক দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় আদিবাসী সর্দারের সঙ্গে কথা বলছে। শমীকের বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি ]

শমীক : তারপর তোমরা ওখানে ওই গাছের তলায়

সর্দার : ওই গাছের নিচেই কবর দিলাম

শমীক : তোমরা সবাই মিলে পাথরের চাঙডগুলোকে
থরে থরে সাজিয়ে রাখলে
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বর্ষার সন্ধ্যায়

সদার : কি বৃষ্টি সেদিন ! এতো বৃষ্টি কখনো দেখিনি।
ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো
মেঘে মেঘে কুমির-আকাশ। হাওয়া রাগত নেকড়ে।

শমীক : আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, খুব স্পষ্ট ; চোখের সামনে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাঁকে।
বিদ্যুতের সাপগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে চোখে মুখে
কুঁদে তোলা পাথুরে মুখটা দৃঢ়, শপথে অটল
পাহাড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর মাথা অনেক উঁচুতে
পায়ের নিচেই মৃত, মৃত ও শায়িত···

সর্দার : শিকারের মতো রক্তমাখা, থ্যাতলানো, হিম, কাঠ···
সাহেবের পাকা হাত, ওস্তাদ শিকারী
একবারও নড়েনি একটুও।
যেন কিছুই হয়নি—এমন সহজ স্বরে তিনি
বলেছিলেন আমাকে :
এখানে পলাশ গাছ পুঁতে দিবি মালী
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে।

শমীক : পঞ্চাশ বছর পরে আমি
সাহেবের প্র-পৌত্র আমি, জিজ্ঞেস করছি
মালী তুমি কিছু জানো কেন, কেন…
কিছু কি শুনেছো? কোনো ঘটনা অথবা…
সর্দার : একটা গুলির শব্দ ছাড়া
কিছুই শুনিনি।
শমীক : এবং চিৎকার?
চিৎকার শোনোনি তুমি?
বাঘিনীর গর্জনের মতো
কখনো শোনোনি? আমি কিন্তু ঠিক শুনতে পাই, ঠিক।
সর্দার : চিৎকার এখনো কানে বাজে ঘুরে ঘুরে আসে।

[ বাগানে মায়া। জানলা দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে।
মায়া শমীকের স্ত্রী। বাগান থেকেই মায়া শমীককে ডাকছে ]

মায়ার কণ্ঠ : কি করছো কি ভেতরে?
বাইরে এসো না!
বিজ্ঞানী-মশাই, শুনছেন, আমি
রৌদ্রে মাতাল হয়েছি।
শমীক : সর্দার, কিছুই জানো না, না?
কিছুই শোনোনি তুমি? তা কি হয়। বলো
আজ বলতে কি দোষ?
অনেক পুরানো কথা।
সর্দার : সে কথা বলতে নেই
শমীক : তবে কিছু জানো·· বলো···কোনো দোষ নেই।
সর্দার : পাহাড়ের দেবতা ডাকতো।
শমীক : পাহাড়ের দেবতা ডাকতো?
সর্দার : ডাকে। দেবতার যাকে ইচ্ছা তাকে ডাকে
দিতে হয়। তাকে দিতে হয়
দেবতার থানে।
ওঁকে ডেকেছিলো।
শমীক : আমার ঠাকমাকে? ডেকেছিলো? আমার ঠাকমাকে?

সর্দার : পাহাড়ের দেবতা ডেকেছিলো।
সাহেব দেননি। দেবতার ধন দেবতা নিজেই
একদিন রাত্রে এসে নিজে নিয়ে গেলো।
সাহেবের বিশ্বাস হয়নি,
ভেবেছিলেন নষ্ট হয়ে গেছে।
তাই পরদিন ভোরে ঝরনার ধারেই…

শমীক : একটা গুলির শব্দ।

মায়ার কণ্ঠ : এটা কি পলাশ গাছ ? কি অদ্ভুত। ছাখো
তুই নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে
স্পন্দিত বীজের মতো। ছাখো
আমি মুকলিত হবো।

সর্দার : অনেক পুরানো কথা। সকলে জানতো
সাহেবের সঙ্গে জঙ্গলে শিকারে গিয়ে…

শমীক : এ কথা আর কে জানে

সর্দার : তারা আজ কেউ নেই

শমীক : শুধু তুমি ছাড়া

সর্দার : শুধু আমি ছাড়া

মায়ার কণ্ঠ : বাইরে, বাইরে এসো
ছাখো, আলোয় আলোয়
পৃথিবী রহস্য হয়ে গেছে।

শমীক : তুমি কেন আছো ?

[ প্রশ্নটা বুঝতে পারলো না সর্দার। তাকালো। ]

তুমি আজো কেন বেঁচে আছো ?

সর্দার : আমারও সময় হলো

শমীক : আমি যেন ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয় তোমার…

সর্দার : আমি যাই।

মায়ার কণ্ঠ : কুরচির কোলাহলে আমি হারিয়ে গেলাম।

শমীক : আমার নির্দোষ দিগন্তকে এইভাবে
রক্তে কলুষিত করে তোমার বাঁচার
অধিকার নেই।

মারাত্মক দুঃস্বপ্ন বিছিয়ে
তুমি ভয় দেখাবে আমাকে ?
তুমি দিতে চাও নিপুণ হত্যার
উত্তরাধিকার ?
মিথ্যা, মিথ্যা, তুমি আদিম মিথ্যার কণ্ঠ।
আমি অস্বীকার করি।
কি প্রমাণ আছে ? এই রূপকথা
কে বিশ্বাস করবে ? কে বলবে
খুনীর বংশের আমি, এই আমি ডক্টর শমীক রায় ?
একটা গুলিতে আমিও তোমাকে
স্তব্ধ করে দিতে পারি,
কিন্তু তা দেবো না, যাও।

[ সর্দার চলে গেলো। তার হাতে তীর-ধনুক ও মৃতপাখি।
স্টেজ অন্ধকার। শমীক একা দাঁড়িয়ে। বাগানে মায়ার কণ্ঠ ]

মায়ার কণ্ঠ : আমি কত হালকা হয়ে গেছি রোদ্দুরে হাওয়ায়
বাইরে, এখানে এসো মেঘের তলায়।

[ শমীক নিরুত্তর। অল্প পরে মায়া এলো।
ওদের দুজনকে ঘিরে আলোর দুটি স্বতন্ত্র বৃত্ত ]

মায়া : কি হয়েছে তোমার বলোতো ?
দু-দিন পাথর হয়ে আছো।
কথা নেই, হাসি নেই, কি ব্যাপার বিজ্ঞানী-মশাই ?

[ শমীক নিরুত্তর। বিরতি ]

বিশেষ সংবাদদাতা, খুঁটি, আজ তেসরা এপ্রিল
ডক্টর শমীক রয়, নাম করা বিজ্ঞানী এবং
অল্পাধিক কবি, পিতামহের আবাস দেখতে এসে
মনোভঙ্গে অত্যন্ত কাতর। চিকিৎসকের মতে তাঁর
এই স্থান ত্যাগ করা অবশ্য বিধেয়। অতএব
হে পতি দেবতা দাসী কলকাতার জন্যেই প্রস্তুত।

[ শমীক নিরুত্তর। বিরতি ]

কিন্তু আমার কি ভালো লাগছে যে ! মনে হচ্ছে আমি
ওই ঝরনার মতন প্রবাহিত হয়ে গেছি দূরে

সমস্ত আকাশ আলো মেঘ পাখির ডানায় বোনা
সত্তার উজ্জ্বল অংশ এতকাল যা ছিলো দুর্জ্ঞেয়
অবারিত হয়ে গেছে আজ, স্বচ্ছতার দীপ্তি লাগে
ভালোবাসার ওপর, এই দেহ মর্মরিত হলো
আমি যেন বলতে পারি . আনন্দিত, আমি আনন্দিত।
স্বামী মহাশয়,
বিষণ্ণ আনন কেন হেরি আপনার ?

[ মায়া শমীকের হাত ধরে টানতে গেলো। শমীক পিছিয়ে এলো। ওবা দু-জন দুটি আলোর স্বতন্ত্র বৃত্তে ]

কথা বলবে না, এই তো ? বয়ে গেছে ! আমি
কথা বলে যাবো, আমি কথা হয়ে গেছি।
কোন ভোরে উঠে গেছি ঝরনার কিনারে ; মগ্ন পুব
পশ্চিম বিভোর। আমি তার মাঝখানে
স্তব্ধতাব বীজ , আমি স্থির, ঘন-কালো,
এই মাত্র ফেটে পডবো যেন। সমস্ত স্তব্ধতা
গান হয়ে যাবে।
চারপাশে রামধনুর বলয়, মৃত্যুব উপরে
উবরতা। শিকড, বল্কল, পাতা, সমস্ত জটিল
উপাদান একটা নিমেষে যেন মন্ত্র হয়ে যাবে।
আমি যে এমন ভাবে ভাবতে পারি জানিনি কখনও।

[ বিরতি। শমীক নিরুত্তর ]

আজকে বাগান অকস্মাৎ চোখের সামনে
ফুল হয়ে গেলো। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আমি
আগে কখনও দেখিনি। ফুলের জন্মের লগ্ন আগে
কখনও দেখিনি। ওই যে পাথর ঢিপি হয়ে আছে
ওর পাশে পলাশ গাছটা অকস্মাৎ জ্বলে উঠলো
কোমল আগুনে, মনে হলো আমার ভিতর থেকে
সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, আমার সত্তার অংশ।

[ শমীক জানলা বন্ধ করে দিলো ]

ও কি করছো ? খুলে দাও, খুলে দাও,
রোদ্দুরে পৃথিবী ভাসছে, চলো ওই পলাশের নিচে
তুমি বসে পড়াশুনা করবে আমি প্যাটার্ন তুলবো।

শমীক : আমার বন্দুক কোথায় রেখেছো মায়া ?

মায়া : কি ব্যাপার ? এমন সকালে শিকারের তৃষ্ণা কেন ?
ওই বুড়োটা নিশ্চয়ই তোমার মাথায়…
জল ডুমুরের কানে ঝরনা অভিভূত কথা বলে
আমাদের কথাগুলো অমন হয় না তো !

শমীক : আমার বন্দুক কোথায় রেখেছো মায়া ?

মায়া : এই ঘরে। এনে দেবো ? এখুনি আনছি
কিন্তু মনে থাকে যেন আজকে শিকার চলবে না।

[ মায়া পাশের ঘরে গেলো। সেই ঘর থেকে বলছে ]

মায়া : শুনতে পাচ্ছো তুমি ?

শমীক : কি ?

মায়া : অজস্র পাখির ডাক।

শমীক : কোথায় ?

মায়া : আমাদের বাগানের ধারে।

শমীক : না।

মায়া : সাবধান লাইভ কার্তুজ।

[ মায়া বন্দুক ও কার্তুজ হাতে দিলো ]

কি চমৎকার বেদি ওই গাছের তলায়
কি নরম মসৃণ গভীর শ্যাওলা দিয়ে মোড়া
আমি আজ রাত্রে ওইখানে শুয়ে থাকবো
আমার ভিতর থেকে চাঁদ উঠে আকাশে দাঁড়াবে।

শমীক : মায়া

মায়া : কি ? এমন করছো কেন ? কি হয়েছে ? বলো।

শমীক : কিছু না তো ! এমনি। কিছু না। মায়া, অন্য কথা বলো
খুব ভালো লাগছে তোমার ? মায়া··

মায়া : আপসোস হয়…

শমীক : কেন ?

মায়া : আগে অতিরিক্ত, অবাঞ্ছিত, মনে হতো।
বিরক্তি ক্লান্তিতে ডুবে থাকতাম।
এখানে আসার পর মনে হচ্ছে
এই গাছ-গাছালি ও পাখি-পাখালির মতো
আমিও এদের একজন।
আমিও এদের অংশ এদের আত্মীয়।
আমি আবিষ্কৃত হয়ে গেছি যেন।

শমীক : ও কথা ভেবো না মায়া। ওই সব
কাঁচা রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাস আমার…
আমার অসহ্য লাগে।

[ মায়া আহত। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। চা নিয়ে বেযারা এলো।
মায়া চুপ করে চা তৈরি করছে ]

আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।
আজকেই প্রবন্ধটা শেষ করে দেবো।

মায়া : কোনটা? টাইম অ্যাণ্ড স্পেস?

শমীক : নো স্পেস। সবটা সময়। সময় শুধু…স্পাইর‍্যাল…
ঘুরে ঘুরে আসে এক তীব্র শান্ত উজ্জ্বল বিন্দুতে।

[ মায়া চা করছে। একটা প্রজাপতি ঘুরছে ওদের
মাথার ওপর। শমীক প্রজাপতিটাকে ধরতে চেষ্টা করছে ]

মায়া : এই বোকা পালা…মারা পড়বি যা, যা…পালা, পালা প্রজাপতি আমি গাছ নই; বোকা। হ্যাঁ, ওদিকে যা। তোমার চ্যান্স আছে ধোরো না, ধোরো না। পালা। বেঁচে গেলি। ফলিত বিজ্ঞানী, তোর কোনো দাম নেই ওর কাছে। ধরো না, ধরো না, পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও, ছাড়ো, ছাড়বে না? আমিও ঠিক উঠে যাবো।

শমীক : ঢাকনিটা দাও

মায়া : কেন?

শমীক : দাও।

[ শমীক ঢাকনি দিয়ে প্রজাপতিটাকে চাপা
দিলো। মায়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলো ]

মায়া : রাত্রে তুমি আঘোরে ঘুমিয়ে। ঘুম আসেনি আমার।
আমি ওই পাহাড়ের দিকে চেয়ে ছিলাম। আমার

চোখদুটো আটকে গিয়েছিলো। শেষ রাতে ঘুম এলো
আর পাহাড় ডাকলো।

শমীক : মায়া···মায়া

মায়া : কি ? কি ?···সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন ! পাহাড় ডাকলো !
চারপাশে পাথরের পবিত্র স্তব্ধতা, জঙ্গলের গন্ধ।
আর এক প্রাচীন গানের কলি···একটানা সুর
শেষ রাতে মাটি আর অরণ্যের বন্দনা বিনত
আমি চলছি তো চলছিই। অজ্ঞাত শক্তির টানে আনন্দিত।
জ্বলন্ত মশাল গাছ, ঝরনায় মাদল, দলবদ্ধ
ছায়া আমার পিছনে। মৃতদের কণ্ঠে পাখি, আলো।
পৃথিবীর রক্ত খুন প্রেম ও প্রতিভা ছড়িয়ে রয়েছে।
শেষকালে একজন করোটিকে বর্শা বিদ্ধ করে
বলে উঠলো : থামতে হলো। সহসা লুটিয়ে পড়লাম।
তুমি ও বন্দুক নিয়ে কি করছো ? রাখো তো। ভয় লাগে।
আজ আমি রক্তপাত সইতে পারবো না। না। রাখো।

শমীক : আজকে কলকাতা যাবো।

মায়া : আজকে যাবো না।
আজকেও দেখবো যদি
পাহাড় আবার ডাকে।

শমীক : আজকেই যাবে।

মায়া : এত রূঢ় স্বরে কথা বলছো কেন
কি হয়েছে তোমার বলো তো ?

শমীক : তুমি আজ যাবে।

মায়া : অদ্ভুত।

শমীক : তোমার মুখটা ঠিক ঠাকমার মতো, অবিকল।

মায়া : তাই বুঝি ? তুমি তাঁকে কখনো দেখেছো নাকি ?

শমীক : মনে হচ্ছে তোমার গলার স্বর ঠাকমার মতো।
আজকেই যাবো। এখানে থাকবো না। কক্‌খনো না।

মায়া : আজ থাক। না। না। কাল যাবো। আজকে পাহাড় ডাকবে।

[ কিছুক্ষণ স্তব্ধতা ]

শমীক : শুনতে পাচ্ছো ?

মায়া : কি ?

শমীক : ব্যর্থ পাখার ঝাপট।

মায়া : বাইরে আসার জন্যে।
প্রজাপতি আলো সোহাগিনী।

শমীক : এতক্ষণে মরিয়া হয়েছে।

মায়া : ছেড়ে দাও

শমীক : আর্তনাদ করছে এখন।

মায়া : ছেড়ে দাও

শমীক : আমার আনন্দ লাগছে। পেশিতে পেশিতে জোর পাচ্ছি।

মায়া : ওকে বাঁচতে দাও।

শমীক : একটু গরম জল দাও। দেবে না ? নিজেই নেবো।

মায়া : কি হয়েছে তোমার আজকে ?

শমীক : আমার রক্তের মন্ত্র আমি আজ শুনতে পেয়েছি।
মৃত, দক্ষ প্রজাপতি, তুমি মৃত, মৃত, মৃত, মৃত।

মায়া : তুমি কি নিষ্ঠুর।

শমীক : আমার রক্তের মন্ত্র আমি আজ শুনতে পেয়েছি।

মায়া : আমার আনন্দ তুমি এইভাবে হত্যা করবে নাকি ?

শমীক : আমি জোর পাচ্ছি।
নৃশংসতা, অকারণ নৃশংসতা। রক্তের ভিতরে
কি আশ্চর্য গুঞ্জন উঠেছে।

মায়া : তুমি কি করে পারলে ?

শমীক : আশাহীন আনন্দের জোরে
অর্থহীন উদ্দীপ্ত ভাবনায়।

মায়া : তুমি কি নিষ্ঠুর !

শমীক : নিষ্ঠুরতা জীবনের পরতে পরতে।

মায়া : এত নৃশংসতা তুমি কি করে লুকিয়ে রাখো ?
কোন ভদ্রতার জটিল মুখোশে ?
আমাকেও একদিন তুমি…

শমীক : মায়া।

মায়া : আমার আশ্চর্য লগ্ন তুমি কলুষিত করে দিলে
আমার সূর্যের গলা টিপে তুমি অন্ধকার দিলে
তুমি যেকোনো সময় খুনী হতে পারো, কি জঘন্য।

শমীক : দিগন্ত ক্রমশ স্পষ্ট।
আমি খুনী হতে পারি। হাসি পায়। প্রাণ নিতে পারি
যেহেতু আমরা প্রাণ দিতে পারি। মৃত্যু কিছু নয়।

মায়া : ঘরটাকে গুহা বলে মনে হয়

শমীক : মায়া

মায়া : কথা বলতেও ঘৃণা করে।

শমীক : ঘৃণা ?

মায়া : ঘৃণা…এই মুহূর্তেই আমি ঘৃণা করলাম তোমাকে

শমীক : মায়া

মায়া : না

[ মায়া বাগানে চলে গেলো। বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়ালো শমীক ]

শমীক : মায়া সরে যাও…সরো।

মায়ার কণ্ঠ : আমার জগতটাকে রক্তে রক্তে নোংরা করে দিলে
তোমাদের প্রতিভা ঘৃণায় এই গ্রহ নিভে যাবে বুঝি
পৃথিবী ভিখারি বুড়ি অন্তিম দিনের প্রতীক্ষায়
তোমাকে এমন ভাবে আমি দেখতে কখনও চাইনি।

শমীক : মায়া।

[ হাত থেকে বন্দুক খসে গেছে। স্টেজ অন্ধকার। বিরতি। কিছু সময় পার হয়ে গেছে। টেবিলে মাথা রেখে শমীক ঘুমিয়ে পড়েছে। তার এক হাত ছোট দূরবীনের ওপর, অন্য হাত বন্দুকের ওপর। শমীক স্বপ্ন দেখছে। ছায়া পড়ছে। দরজায় শব্দ ]

শমীক : কে ?

ছায়া : দরজা খোলো।

শমীক : না।

ছায়া : তবে কাছে এসো।

শমীক : কেন ?

ছায়া : তোমাকে দেখিনি। দেখি···
কচিদের মুখের দুধের গন্ধ বড় ভালো লাগে।
শমীক : আমি খুব বড় হয়ে গেছি
ছায়া : তাই বুঝি ? তাই অকারণ।
শমীক : কে তুমি ? কে ?
ছায়া : তোমাদের আরম্ভ হয়নি।
শমীক : দেখছো না, পৃথিবী রহস্য নয়। অঙ্কের নিয়মে
এখন সমস্ত গ্রহ আমাদের মুঠোর ভিতর।
ছায়া : তবু কত অনিশ্চিত। স্থির হতে গিয়ে
ভীষণ অস্থির। প্রেম চেয়ে
ঘৃণার পূজারী।
শমীক : তোমার গলার স্বর অমন গম্ভীর লাগে কেন ?
ছায়া : নদী শস্য কুয়াশায় পূর্ণ হয়ে গেছি।
শমীক : আমি ভীষণ অপূর্ণ।
তোমার গলার স্বর বড় পরিচিত।
ছায়া : আমাদের এক উৎস, কিন্তু ভিন্ন শাখা।
শমীক : মানে ?
ছায়া : একটি জীবন, প্রবহমানতা ; শুধু পৃথক আধার।
শমীক : কে, তুমি কে ?
ছায়া : ধুলো, ধুলোর ফুলকি।
শমীক : যুক্তিহীন কথা। শব্দের বিভ্রান্তি, ভুল।
আগুনের ফুলকি হয়। তোমার মুখটা ঠিক মায়ার মতন।
মনে হলো তুমি বুঝি মায়া।
ছায়া : আমাকে আসতে দাও আজকে বিয়ের দিন।
শমীক : তবে তুমি সেই,
ছায়া : আমি সেই।
শমীক : তোমার মুখটা ঠিক মায়ার মতন।
কি করে তোমার মুখ মায়ার মতন হলো ? কেন ?
হতে পারে। হতে পারে। বিস্ময়ের কিছু নেই এতে।
ছায়া : তুমি ওকে গুলি করতে গেলে ?

শমীক : পাহাড়ের ডাক শুনে আমার…আমার…

ছায়া : আমার মতন চলে গিয়েছিলো। তাই ?

শমীক : তুমি কেন গিয়েছিলে ?

ছায়া : সত্যিই পাহাড় ডাকতো। দূর গ্রহ আলো ফেলে ফেলে
নিয়ে যেতো, তরঙ্গের বিশুদ্ধ ভাষায় মন্ত্রমুগ্ধ,
সঙ্গীতের শয্যা পাতা পাথরে পাথরে, মনে হতো
শরীর সংকেতবহ, বাতিঘর, তাই মূল্যবান
দৃশ্য অদৃশ্যের আমি সেতুপথ। তা ছাড়া তুচ্ছই।
কতদিন নিজেকে বিছিয়ে দিয়ে পাহাড়ের নিচে
পৃথিবীর অন্ধকার উবরতা হয়ে গেছি আমি
পরিপূর্ণ দিঘির মতন টলমল করেছি জ্যোৎস্নায়

শমীক : কেন আমি এমন অপূর্ণ ?
মায়া মাঝে মাঝে ঝরনা হয়ে যায়
প্রতিবেশে যথাযথ, একাত্মক, অনিবার্য, স্বর
আমি তা পারি না
ও-ডাকে যখন আমি সাড়া দিতে চাই
কিন্তু সব উচ্চারণ আর্তনাদ হয়ে ওঠে যেন,
আমি গুলি করিনি মায়াকে
আমি তার আনন্দকে নিহত করেছি
আমি খুনী, খুনী, খুনী।

ছায়া : কি তোমার হাতে ?

শমীক : দূরবীন, রাইফেল।

ছায়া : পায়ের তলায় ?

শমীক : পৃথিবী, অস্থির গ্রহ।

ছায়া : তুমি নিজে ?

শমীক : বিবর্ণ, পীড়িত।

ছায়া : আর মায়া।

শমীক : আনন্দিত। আমি তার আনন্দকে নিহত করেছি
আমাদের মাঝখানে রক্তের নদীর ব্যবধান।

[ ছায়া হাসছে। ঝরনা ও মাদলের স্বর স্পষ্টতর ]

আমার এ ঘর গুহা হয়ে গেছে

[ ছায়া হাসছে ]

অসহ্য, অসহ্য, হাসি। তুমি এত ক্রুর হতে পারো ?
আমি গুলি করতেও অক্ষম।

[ ছায়া হাসছে ]

আর ছিন্ন করো না আমাকে
আমি এক অনির্ণেয় হাহাকার
ঐক্যে গাঁথা কখনও হবো না ?
দুটি বিরুদ্ধ জগত কখনও মিলবে না ?

[ ছায়া হাসছে ]

অন্তর বাহির হোক
বাহির অন্তর।

ছায়া : আসীনো দূরং ব্রজতি
শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং সদাসদং দেবং
সদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি।

[ ছায়া মিলিয়ে গেলো ]

শমীক : মায়া, মায়া, কেউ নেই ?
আমার ডাকের সাড়া দিতে
কেউ নেই আমি কি নির্জন পোড়ো বাড়ি !

[ শমীক উঠে দাঁড়ালো আর পরদা নেমে এলো।
মাদল ও ঝরনার শব্দ বিপুল ভাবে ধ্বনিত হচ্ছে। ]

রাম বসু

# আতস কাঁচে আলো

( শহরতলির সাবেকী বাড়ি। এ অঞ্চলটা নির্জন। গাছ গাছালি প্রচুর। বাড়িটা পুরানো। সর্বাঙ্গে অযত্নের চিহ্ন। তবু দেখে বোঝা যায় যে একদিন এই বাড়ির শ্রী ছিলো। ঘেরা বারান্দা থেকে ঘরে ঢোকার মুখে এখনও হ্যাট রাখার ষ্টাণ্ড। মাঝখানে আয়না এখনও আছে। তবে আর মুখ দেখা যায় না। পর্দা ওঠার পর মৃদু আলোয় বারান্দা দেখা যাবে। কয়েকটা চেয়ার ছড়ানো। মাঝখানে একটা শ্বেত পাথরের টেবিল। টিপয়ের ওপর কয়েকটা বই। ডান দিকের একটা ঘরে মরচে পড়া বড় তালা। তালার ওপর আলো কিছুক্ষণ চিক্ চিক্ করবে। বাঁদিকে বারান্দার এক কোণে টেলি-ফোন। ধারে বই-এর ছোট আলমারি। একটু পরে বাঁদিকের ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াবে মল্লিকা। মল্লিকার রূপ সাধারণ। যৌবন যায়নি। তখন সকাল হয়েছে। মল্লিকা হাত দিয়ে আলতো ভাবে অবাধ্য চুল ঠিক করতে করতে আয়নার দিকে ঝুঁকে মুখ দেখতে চেষ্টা করে। ভালোভাবে দেখতে পায় না। হাসে। তারপর অনুচ্চ গলায় বলে ]

মল্লিকা : ও মা, এই কি আমার মুখ ! এত ঢেউ ?
বাঁকা চোরা, তোবড়ানো, আহা !
আমি তোর চেয়ে ঢের রূপসী ; বুঝলি।

[ মল্লিকা সরে আসে। শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর ফুল পড়ে আছে। মল্লিকা ফুলদানি সাজায়। পাখি ডাকে। কিছুক্ষণ যায়। বাঁদিকের বারান্দার কোণ থেকে একটা মেয়ে বলে ওঠে ]

মেয়েটি : যে দিন ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে

[ ভাঙা ভাঙা সুরে বাচ্চা মেয়ের গলায় গান শুনে ফিক্ করে হেসে মল্লিকা বলে ]

মল্লিকা : ও ! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা !

মেয়েটি : উঃ, পালিয়ে যাবো।

মল্লিকা : পালাতে হবে না, আয়।

মেয়েটি : না। যাবো না।

মল্লিকা : আয় দুষ্ট কোথাকার।

মেয়েটি : তা হলে দেখাবে ?

মল্লিকা : কি দেখাবো ?

মেয়েটি : ওই ঘর—যার মধ্যে মণি মুক্তো আছে

[ মল্লিকা হাসলো ]

কত বড় তালা ! লোহার দরজা কেন ?
চোরে বুঝি চুরি করে নেবে ? তাই বুঝি ?

মল্লিকা : চোরে নিতে পারে না রে
এই মুক্তো চুরি করে নেবে
চোরের এমন সাধ্যি নেই।

মেয়েটি : বলো না আর কি আছে ? লক্ষ্মী মাসী বলো।

মল্লিকা : চুনী পান্না

মেয়েটি : আর ?

মল্লিকা : প্রবাল মাণিক

মেয়েটি : আর ? আর ?

মল্লিকা : স্বপ্ন ও সর্বস্ব

মেয়েটি : আমাকে দেখাও মাসী
সর্বস্ব দেখাও দেখি

[ মল্লিকা খিল খিল করে হাসে। মেয়েটি বোধ হয় অপ্রস্তুত হলো। চুপ করে থাকলো। কিছু পরে হাসি থামলো মল্লিকার ]

এত হাসো ! এত হাসো কেন ?

মল্লিকা : সর্বস্ব দেখবিনে ?

মেয়েটি : দেখালে তো

মল্লিকা : তবে আয়, কাছে আয়
দূর থেকে কি করে দেখাবো ?

মেয়েটি : কাছে গেলে গাল টিপে দেবে।

[ মল্লিকা হাসলো। মেয়েটি চুপ করে থাকলো ]

মল্লিকা : তোর মা বুঝি টেপে না।

মেয়েটি : আহা, সে তো মা !

মল্লিকা : আর আমি ?

মেয়েটি : ফুল মাসী।

[ মল্লিকা হাসলো। মেয়েটি চুপ করে থাকলো ]

কলেজে গেলে না ?

মল্লিকা : আজ তোকেই পড়াবো।

মেয়েটি : আমি অত পড়ি কিনা।

মল্লিকা : একদিন পড়বি তো।

মেয়েটি : ও ঘরে কি আছে, বলো।
সেই রাজকন্যা, পক্ষীরাজ
একদিনও তাদের দেখিনি।

মল্লিকা : কিছুই নেই রে ; কিছু নেই
অন্ধকার শুধু
শুধু অন্ধকার।

[ মল্লিকার গলা অকস্মাৎ ভারি হয়ে এলো

কি আছে আমি কি জানি ?
আমিও জানি না

মেয়েটি : তুমিও জানো না ?
তুমিও দেখোনি সেই মণি মুক্তো, পক্ষীরাজ ?

মল্লিকা : একদিনও না।

মেয়েটি : মিথ্যে কথা।

[ মল্লিকা নিঃশব্দে হাসলো ]

মল্লিকা : ওই ঘর তোর কাছে
ভীষণ রহস্য হয়ে আছে।
থাকার-ই কথা।
থাক না, রহস্য থাক
তা হলে বাঁচাটা সহনীয় হয়
সোনা, আয়, ঘরে আয়।
আয় না রাক্ষসী।
আয়।

মেয়েটি : না, তুমি বাইরে এসো
গাছের ছায়ায় এসো
দোলনায় দোল দেবো।
এসো ফুল মাসী।

মল্লিকা : আমি তো বাইরে যাই
আজ তুই ঘরে আয়।
ঘরের ভিতবে।

মেয়েটি : ভিতরে কিসের গন্ধ।

মল্লিকা : কিসের গন্ধ রে ?

মেয়েটি : কি জানি, কিসের গন্ধ।
চামচিকে, অন্ধকার—
তুমি বাইরে এসো না
তুমি বাইরে এসো না

[ যেন নিজেকে বলছে ]

মল্লিকা : আমি আর বাইরে যাবো না

মেয়েটি : তুমি বাইরে এসো না

মল্লিকা : না। না।

মেয়েটি : ভিতরে কিসের গন্ধ ?

[ মেয়েটি 'ভিতরে কিসের গন্ধ' বার বার বলতে বলতে চলে যায়। তার গলা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায। মল্লিকা শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর মাথা রেখে বন্ধ ঘরটার দিকে তাকায়। তালার ওপর আলো পড়ে। একটু পরে এলেন সান্যাল মশাই। ইনি প্রৌঢ় ও সুদর্শন ]

সান্যাল : ও বাড়ির সেই মেয়ে বুঝি ?

[ এত সকালে সান্যালকে দেখে অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো মল্লিকা। একটু চমকেও উঠলো ]

মল্লিকা কি কাণ্ড সান্যাল কাকা ? এত ভোরে কেন ?

[ মল্লিকার কথায় জবাব না দিয়ে হো হো করে হেসে বলে উঠলেন সান্যাল মশাই]

সান্যাল : বেশ বলেছে মল্লিকা !
ভিতরে কিসের গন্ধ—
বেশ বলেছে মল্লিকা !

মল্লিকা : এই এক খেলা ওর
রোজ এসে এক কথা বলে
ফুল পেড়ে দেয়

সান্যাল : ভিতরে কিসের গন্ধ !

মল্লিকা : আর ওই বন্ধ ঘর ওর কাছে রূপকথা যেন
সমস্ত রহস্য যেন জমে আছে, যেন
ওই রহস্যের তল পেলে সব স্বচ্ছ হয়ে যাবে।
কি চোখে ও ঘরটাকে দেখেছে জানি না।
যাকগে, সান্যাল কাকা এত ভোরে ? অবাক লাগছে।

সান্যাল : ডাক দিয়েছো কোন সকালে

মল্লিকা : মোটেই ডাকিনি আমি

সান্যাল : তুমি না, তোমার শ্বশ্রূমাতা

মল্লিকা : ও ! তাই বলুন

সান্যাল : তুমি কিছুই জানো না ?

মল্লিকা : না তো !

সান্যাল : কিছুই জানো না ?

মল্লিকা : কি জানবো ? কি আছে জানার ?
ডেকেছেন—নিশ্চয় ডাকার
কোনো দরকার আছে। ব্যাস।

সান্যাল : ব্যাস ? এত নিরাসক্ত তুমি ?

[ মল্লিকা হাসলো। সান্যাল একটু বিব্রত হলেন ]

হয়তো তোমার আসক্তির সঙ্গত কারণ নেই।

মল্লিকা : না, না, তা কেন ? ও সব থাক। ছেড়ে দিন।

সান্যাল : আমি জানি। সব বুঝি। কিন্তু
কি করবো মল্লিকা !
করার কিছুই নেই।
বিপ্রদাস সমস্ত জানতো না
তাকেও বলিনি সব।
খোঁজা খুঁজি সে একটুকুও পছন্দ করতো না
বলতো—শ্যামল গিয়েছে
নিশ্চয়ই এখানে থাকার মধ্যে যথেষ্ট তাৎপর্য
সে খুঁজে পায়নি। তাই চলে গেলো। তাকে
যেতে কখনও বলিনি।
হয়তো কথাটা তার দিক থেকে বিচার করলে—

মল্লিকা : যাকগে ও সব কথা।

সান্যাল : আজ আর কোনো লাভ নেই।
তুমি যদি ভেবে ত্যাখো—নিরাসক্ত হয়ে

মল্লিকা : মাকে ডেকে আনি।

সান্যাল : বোসো না একটু।

মল্লিকা : আপনি জানেন ও সব প্রসঙ্গ আমি···

সান্যাল : তোমার সংকোচ বুঝি
যদি ভেবে দেখা যায়—তোমার কি দোষ
মণিমালা প্রথমে হয়তো ভেবেছিলো···
শুধু মণি কেন—বিপ্রদাস, সেও···

মল্লিকা : হ্যাঁ, তাঁরা প্রথমে আমাদের
মেনে নিতে পারেননি।···তাঁদেরও

সান্যাল : প্রথমে···প্রথমে···
তারপর সব ঠিক হয়ে গেলো।

মল্লিকা : ঠিক হলো—যখন, বেঠিক ঠিক
সমস্ত সমান ; সমস্তই অর্থহীন।
যা অবশ্যম্ভাবী তা নিয়ে সান্যাল কাকা

সান্যাল : আমি তা মানি না।
মানুষ ভাগ্যের দাস—
একথা স্বীকার করা···তার মানে···মানে।
বিপ্রদাস বলে···
তবে কি, মল্লিকা, জানো—
বিপ্রদাস সত্যটা ধরেছে
সত্য তো নিষ্ঠুর ; সত্য নির্মম নিষাদ
ছেড়ে কথা বলে না কাউকে।
ভীষণ অস্থির বিশ্বে
মানুষ নোঙর ছেঁড়া যেন।

মল্লিকা : না, না, ওঁরা সব নিষ্ঠুর হবেন কেন ?
আমি ওসব ভাবি না
এই ঘর হলো সমস্ত নষ্টের মূল

যার কাছে এ ঘর মন্দির
ওঁর কাছে মৃত্যুপুরী, গলায় ঝোলানো ভারি শিলা
আপনার কাছে পীঠস্থান
ভীষণ অস্থির বিশ্বে বিশ্বাসের প্রাচীন নোঙর
মেয়েটির কাছে রূপকথা
অথচ আমার কাছে অর্থহীন, বিবর্ণ সংস্কার
মেক বিলিভ, পালাবার পথ।

[ সান্যাল স্পষ্টত আহত হলেন ]

সান্যাল : মল্লিকা তোমার মুখে এই সব কথা বেমানান
আগে তো জানিনি তুমি এত অবিশ্বাসী
তুমি কি এখনও ওই দরজায় প্রদীপ দাও না ?

[ মল্লিকা হাসলো। ]

মল্লিকা : রোজ দিয়ে থাকি। নিয়মিত। সন্ধ্যাবেলা।
একদিনও বাদ যায় না কখনো।

সান্যাল : তবে ? এত অবিশ্বাস নিয়ে ?

মল্লিকা : আমার বিশ্বাস আর অবিশ্বাস, কাকা
এই ক্ষেত্রে নিরর্থক।
যে কোনো কারণে হোক
আমি এ বাড়ির বৌ
—সামাজিক পরিচয় এই।
আর, আমার শাশুড়ী চান, আমি যেন রোজ
রোজ আলো দেই, ধুনো দেই
তাতে নাকি আমার শ্বশুর
মৃত্যু থেকে উজ্জীবিত হয়ে ভবিষ্যতের ঘাঁটিগুলো
আগলে রাখেন। অন্তত বিশ্বাস তাই।
তাঁকে ধাক্কা দিয়ে কি লাভ আমার ?
যদি এতে শান্তি হয় তাঁর —তাই হোক
এ সব আমাকে স্পর্শ করে না একটুও।

সান্যাল : তুমি এত নিরাসক্ত ? এত উদাসীন ?
এ বাড়ির ভাগ্য, ভালো মন্দ—কিছুতে জড়িত নও ?

মল্লিকা : এ সব থাক না কাকা।

[ মল্লিকা টেলিফোনের কাছে গেলো। ডায়াল করে রিসিভার তুললো। সান্যাল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। রিসিভার নমালো মল্লিকা ]

মল্লিকা : ভোরবেলা কার সঙ্গে এত কথা—আচ্ছা, টের পাবো।

সান্যাল : অথচ তোমাকে আমি

মল্লিকা : যা ভাবতেন তা আমি নই। এই তো ! এই না ?

[ সান্যাল তাকালেন ]

ওই ঘর—আপনারা ভাবেন
পূর্ব পুরুষের আত্মার কনফারেন্স করে ওই ঘরে।
এ কথা মানবে কেউ।
বুদ্ধি ও বিচারে গ্রহণীয় ?
না, সে দাবী করে না কেউ।
এও ··এও ধবে নেওয়া।
বাঁচতে গেলে ধরে নিতে হয়।
নিরালম্ব নিরাশ্রিত বায়ু ভূত হয়ে বাঁচা অসম্ভব।
বাঁচা এক জাবদা বাস্তব ব্যাপার।

সান্যাল : তবে কি শ্যামল উত্তেজিত হয়েছিলো

মল্লিকা : আমার ইংগিতে ?

সান্যাল : যদি বলি

মল্লিকা : আপত্তি করাব মতো উৎসাহ থাকছে না।

সান্যাল : শ্যামল সম্পর্কে কোনো উৎসাহ, উদ্বেগ আর নেই ?

মল্লিকা : কেন এই ভাবে বিব্রত করেন কাকা ?

সান্যাল : না, না, বলো—

মল্লিকা : মাকে ডেকে আনি।

সান্যাল : বইটা আমাকে দাও
বিপ্রদাসের বইটা

[ মল্লিকা তাকালো ]

নামাটাও মনে নেই ?
ম্যান ইন আনসার্টেন ওয়ার্ল্ড

মল্লিকা : ও!

[ মল্লিকা আলমারি থেকে বই বার করে ]

সান্যাল : আরও কত কি দেখতে হবে যে !

[ মল্লিকা বইটা দিলো ]

মল্লিকা : যদি দুঃখ দিয়ে থাকি—
আমি দুঃখ দিতে চাইনি আপনাকে।

[ মল্লিকা বাঁ দিকের ঘরে চলে গেলো। বই-এর পাতা ওলটাতে থাকেন সান্যাল মশাই। একটু পরে আসেন মণিমালা । মণিমালা প্রৌঢ়, বিধবা। সান্যাল মশাইকে পড়তে দেখে একটু দাঁড়ান ]

মণিমালা : ম্যান ইন আনসার্টেন ওয়ার্ল্ড
ফেলে দিন ডাস্টবিনে

[ সান্যাল সশব্দে বইটা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসেন ]

সান্যাল : তোমাদের কি হলো আজকে ?
সকলেরই পর্দা চড়া

মণিমালা : তাই বলতেই ডেকেছি ভোর বেলা
রাতেই ডাকাতাম। নিন।

[ একটা টেলিগ্রাম দিলেন মণিমালা ; সান্যাল টেলিগ্রাম পড়লেন। তাকে অভিভূত দেখাচ্ছে। মণিমালা ফিস ফিস করে বলেন ]

মণিমালা : শ্যামল আসছে !

[ বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন সান্যাল ]

শ্যামল আসছে !
বিশ্বাস হচ্ছে না ?

সান্যাল : কবে, সে কথা লেখেনি।

মণিমালা : এখুনি…যেকোনো সময়ে সে আসতে পারে
আজ কাল পরশু অথবা এক যুগ পরে। তবে—
তবে সে আসছেই
এই কি যথেষ্ট নয় ?
চুপ করে কেন ?
কি দেখেন মরা মাছের মতন ?
চোখদুটো দপ করে নক্ষত্র হলো না ?
আপনার আনন্দ হচ্ছে না ?
উৎসবের বাড়ি হয়ে উঠলো না তো আপনার মুখ

শ্যামল আসছে
শ্যামল আসছে ! আর—

[ টেলিগ্রামটা আবার পড়ার চেষ্টা করলেন সান্যাল মশাই। মণিমালা তাড়াতাড়ি কেড়ে নিয়ে সেটা লুকিয়ে ফেললেন ]

অবিশ্বাসী ! আপনি এ পড়ার
উপযুক্ত নন। দিন।

সান্যাল : কই, মল্লিকা তো কিছুই বলেনি। সে কি—

মণিমালা : [ গলা নামিয়ে ] মল্লিকা জানে না।

সান্যাল : শ্যামল আসছে ; অথচ মল্লিকা···
জানে না···শ্যামল আসছে !

মণিমালা : কেন বলবো ? যদি সে আবার তাকে···
মন বলে মল্লিকার জন্যে ওই ছেলে নিরুদ্দেশ হলো।
যদি সে আবার তাকে···

সান্যাল : যদি সে আবার তাকে ?

মণিমালা : যদি সে আবার তাকে বশ করে নেয়।

সান্যাল : যদি সে আবার তাকে বশ করে নেয় ?

মণিমালা : তা হলে দাঁড়াবো কোথায় ?
শ্যামল আমার ছেলে
মার স্নেহ কাকে বলে
তা কখনও জানেনি শ্যামল
ওর বাবা সবটুকু নিয়ে ছিলো
বেচারা শ্যামল ·
সে আসুক আগে
দেখবেন, আমি তাকে পূর্ণ করে দেবো।
মল্লিকার দিকে আর ফিরে তাকাবে না
গোমর ভাঙবে। মেয়েটার অহংকার দেখে চোখ—

সান্যাল : মল্লিকা তোমার এত কাছে, এত করে !
বিপ্রদাস মারা গেলে সে-ই তো তোমাকে
আগলে রেখেছে। আর তুমি তাকে
অহংকারী বলো ?

শ্যামল আসছে—এই খবরটুকুও
দিতে বেধে গেলো ?
মণিমালা কি হচ্ছো তোমরা ?

মণিমালা : আটটা বছর পরে শ্যামল ফিরছে
আটটা বছর—তার মানে কি জানেন ?
পথ চেয়ে থাকা কত ক্রূর, ভয়াবহ
তা কি করে বুঝবেন।
বুক পুড়ে খাক হয়ে যায়।
সব ছিঁড়ে যায়
শিরাগুলো খুলে আসে যেন

সান্যাল : মল্লিকাও পথ চেয়ে আছে

মণিমালা : মা আর বউ এক কথা হলো ?

সান্যাল : তুমি পথ চেয়ে ছিলে না, বরং
বিপ্রদাসের স্মৃতিতে তুমি ডুবে ছিলে।

মণিমালা : স্মৃতি ! স্মৃতি নিয়ে মানুষ বাঁচে না
দুদিনেই রঙ চটে যায়
টিনের সুটকেস।

সান্যাল : তাই তো দেখছি

মণিমালা : আপনার বন্ধুকে আমি খুব কাছে থেকে
দেখেছি বলেই, আজ আর কোনো মোহ নেই।

সান্যাল : আজ। আজ আর নেই। তবে
একদিন ছিলে।
একদিন তার ছায়া ছিলে
তার প্রতিধ্বনি।

মণিমালা : আমি তার মাশুল গুণিনি ?
সুদ শুদ্ধ গুণে দিতে হয়নি আমাকে ?
আটটা বছর ধরে তিলে তিলে পুড়তে হয়নি
রাত্রির আঁধার ভিজে যায়নি কান্নায় ?
মা নই, মা নই আমি
আমি এক জঘন্য কুমীর

যে তার বাচ্চাকে মেরে ফেলে ;
এই অনুভবে সূর্য তিরস্কৃত করেনি আমাকে ?
কি হচ্ছি আমরা তা কি করে বুঝবেন ?
দিন, চাবি দিন !

সান্যাল : চাবি '
মণিমালা : ও ঘরের চাবি
সান্যাল : তোমাদের চাবি কি করে আমার কাছে
থাকতে পারে ? কে বলেছে···চাবি যে আমার···
মণিমালা : চাবি আপনার কাছেই
সান্যাল : কি করে জানলে
মণিমালা : উনি বলেছেন
সান্যাল : বিপ্রদাস ?
মণিমালা : অবিশ্বাস হলো ?
সান্যাল : বিপ্রদাস তোমাকে বলেছে যে
ও ঘরের চাবি
রয়েছে আমার কাছে ?
মণিমালা : মরার কয়েক ঘণ্টা আগে
সান্যাল : বিপ্র এ কথা বলেছে ?
মণিমালা : মিথ্যে বলার দরকার ?
আর আপনি তো জানেন যে
চাবি না হলেও দোব খোলা যায়।
তবে ! অহেতুক মিথ্যা বলে লাভ ?
সান্যাল : কিন্তু এ কথাটা ভীষণ গোপন ছিলো
বিপ্র কাউকে বলবে না
কথা দিয়েছিলো ; পাছে অবিশ্বাসী হয়ে
চাবি চেয়ে নাও।
মণিমালা : সে কথা থাকেনি। উনি নিজে বলেছেন।
তাহলে দেখছেন।
সান্যাল : বিপ্র যে এমন ভাবে হেরে যাবে···বিপ্র···
হয়তো···অবশ্য বিকারের ঘোরে যদি বলে থাকে-

মণিমালা : সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, উনি নিজে বলেছেন।
আবিলতা কোথাও ছিলো না
বিশ্বাস হলো না ?

সান্যাল : আমি ভাবতেই পারি না

মণিমালা : আর কি কি আপনি ভাবতেও পারেন না ?

সান্যাল : তোমরা সবাই মিলে পাগল করবে কি ?

মণিমালা : চাবি দিন। চাবি চাই।

সান্যাল : সে আমার কাছে নেই।

মণিমালা : কোথায়। সে চাবি ?

সান্যাল : পুকুরে।

মণিমালা : পুকুরে ?

সান্যাল : জানতাম তোমরা চাবির কথা
জানতে চাইবেই। তাই পাছে
অবিশ্বাসী হই
তাই সেই চাবি পুকুরে ফেলেছি।

মণিমালা : সেই চাবি পুকুরে ফেলেছেন ?

সান্যাল : অথচ বিপ্রই নিজে অবিশ্বাসী হলো !
অথচ বিপ্রই নিজে অবিশ্বাসী হলো !

[ ওরা দু'জনেই চুপ করে থাকলো ]

সান্যাল : আশ্চর্য

মণিমালা : তাহলে উপায় ?
শ্যামল যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে।
উৎকণ্ঠায় আমি
যেন ছিলে-বাঁধা ব্যাধের ধনুক।
তার আগে দোর খোলা চাই
তার আগে সমস্ত অতীত মুছে হওয়া চাই মেঘ।

সান্যাল : ওই ঘর খুলবে ? মণিমালা তুমি, তুমি
ওই ঘর খুলে দেবে ? নোঙর ছিঁড়বে কি ?

মণিমালা : নিশ্চয়ই
শ্যামলকে বোঝাতে চাই

জয় হলো তার

সান্যাল : তুমি বিশ্বাস করো না মণিমালা রাত্রে অন্ধকারে
বংশের আত্মারা এসে ওই ঘরে আবির্ভূত হন
তুমি বিশ্বাস করো না বিপ্রদাস তার সঙ্গে থাকে
তুমি বিশ্বাস করো না ওই ঘর খুলে দিলে
তোমাদের অমঙ্গল হবে। ঢেউ-এ বাড়ি
চুরমার খান খান হবে।—

[ মণিমালা অস্বাভাবিক ভাবে হেসে উঠলো। বিব্রত হলেন সান্যাল ]

মণিমালা : আশ্চর্য বিশ্বাস !

সান্যাল : তোমার বিশ্বাস ?

মণিমালা : পচে ঢোল হয়ে গেছে
ভীষণ দুর্গন্ধ তার।
শ্যামল আসছে
তার আগে সমস্ত অতীত
ঝেটিয়ে বিদায় করে দাও।
তাকে বুঝতে দাও সে আর নিঃসঙ্গ নয়
সে থাকবে মায়ের কাছে
একা একা মুখ চূণ করে তাকে থাকতে হবে নাকো
কখনও চিলের ছাদে কখনও বা গাছের তলায়।
মাটিতে বিছিয়ে মূল উচ্ছ্বসিত গাছ হবে সে-ই।

সান্যাল : তুমি যে এমন হবে তা আমি ভাবতেও পারি না।
কোথায় চলেছো মণি ? লক্ষহীন তীরের মতন—

মণিমালা : আমি ভাবতেও পারি না মতিভ্রম কেন হয়েছিলো !
শ্যামলের যা পাওনা তা চুকিয়ে না দিলে শান্তি নেই

সান্যাল : তুমি ছিলে ছায়ার মতন। প্রতি কথা বেদ বাক্য।
বিপ্রদাস জুড়ে ছিলো তোমার সমস্ত। মনে নেই মণি
এমন কি শ্যামল ছিলো···

মণিমালা : অবাঞ্ছিত। তাই-ই, অবাঞ্ছিত। অবাঞ্ছিত বলে
নিরুদ্দেশ হলো। আমি জঘন্য কুমীর।

[ আর্তনাদ করে মণিমালা চুপ করলেন। এক ধাক্কায় যেন অতীতে চলে গেছেন ]

উনি চাইতেন আমরা দুজন থাকি
যেকোনো তৃতীয় অবাঞ্ছিত
এমন কি সৃষ্টিও।
শ্যামলকে দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে গিয়ে
প্রাকৃতিক হিসেবের ভুল বলে ধরে নিতে গিয়ে
বিরোধ ঘনালো। প্রচ্ছন্ন শত্রুতা মাথা চাড়া দিলো।
শ্যামল নিজের দাবী নিয়ে দুবিনীত, আমি ভীত।
সংকট আমার কি কঠিন ! বেছে নিতে হবে একজন
হয় স্বামী না হয় শ্যামল !
ভাবতেও বমি আসে। আর এই অবস্থার জন্যে
কে দায়ী জানেন ? আপনার বন্ধু ও গুরু।

সান্যাল : মণিমালা তোমার বিকার—এ ঘোর বিকার ! রোগ !

মণিমালা : আর এই বিকারের মধ্যে কে টানলো আমাকে ?
আপনার বন্ধু ও গুরু
মহাপ্রাণ, দ্রষ্টা, ঋষি

সান্যাল : আমি উঠি। অসহ্য এসব। তোমরা বিকৃত. মণি
শ্যামল গিয়েছে তার মানে এই নয় বিপ্রদাস
ঘাড ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। না ; এ মতের লড়াই।

মণিমালা : অথচ এ সব আমি তখনও বুঝিনি
শ্যামল যাবার পর, উনি মারা গেলে
যখন আমাকে কেউ আচ্ছাদিত করে দিতে নেই
তখনই বুঝেছি। বুঝেছি কালকে, রাতে, টেলিগ্রাম
বজ্রের মতন নাড়া দিয়ে চেতনা ফিরিয়ে দিলো
তখনই বুঝলাম কেন নিরুদ্দেশ হলো আমার শ্যামল।
আমি তাকে নির্বাসনে দিয়ে
হাসিমুখে আছি। তা ছাড়া যাবার অন্য যুক্তি নেই
মতের লড়াই নয়। আদর্শের সংঘাতও এ নয়।
আপনি কি ভাবেন
শ্যামল ঘরের দোর ভাঙতে গেলো বলে
ঝগড়া হলো আর সেই অভিমানে

হারালো শ্যামল। আজ আটটা বছর।
এই কি ভাবেন? সান্যাল মশাই, এত অভিমানী
ছেলে? আমি, আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, আমি।

সান্যাল : এত কাল পরে তাই যদি মনে হয়

মণিমালা : যদি···মনে হয়·· কেন? তাই, তাই, তাই
দরজা ভাঙুন। শ্যামল আসছে আজ
অজ্ঞাতবাসের পর্ব শেষ হলো।
আমি অনেক ঠকেছি
আর ঠকতে রাজি নই
যে যাদুতে মৃতকে জীবন্ত বলে মনে হতো
সেই যাদু নেই। আজ চিনেছি নিজেকে।

সান্যাল : এই চেনা ফের যদি ভুল চেনা হয়
যদি ছ্যাখো গতির দয়ায় তুমি লক্ষ্যহীন তীর
নোঙরবিহীন নৌকো স্রোতের খেয়ালে

[ টেলিফোন বাজলো। ওঁরা কথা থামালেন। মণিমালা এগিয়ে যাবেন এমন সময় এলো মল্লিকা। টেলিফোন ধরলো সে ]

এই চেনা ফের যদি ভুল চেনা হয়
ভীষণ অস্থির বিশ্বে কোনখানে দাঁড়াবে ভেবেছো?

মল্লিকা : আর কার গলা হবে? ভালো লাগছে না? ও!
কোথা থেকে? এরোড্রাম? কোথায়? লণ্ডন?
কি? স্কলারশীপ নিয়ে। বেশ তো, যাও না।

মণিমালা : শ্যামলের কথা

[ সান্যালের কানে কানে ]

যেন এখানে না ওঠে।

সান্যাল : সব ওর জানা দরকার; মণিমালা
এই ঘটনায় মল্লিকারও দায় আছে।

মণিমালা : না; এখন নয়।—আমার, আমার শুধু।

মল্লিকা : এরোড্রাম থেকে? আমি বিশ্বাস করি না।

সান্যাল : মল্লিকাকে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার নেই
এই অনিশ্চিত বিশ্বে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়
মনে পড়ে ? বিপ্রদাসের এ সব কথা, মণি ?

মণিমালা : চমৎকার ব্যর্থ দেশনেতা। এই সব ছলা কলা
জনতার মিটিং-এ মানায়। আমাকে রেহাই দিন।

সান্যাল : আমি ব্যর্থ অস্বীকার কখনো করিনি

মল্লিকা : না, না, ওসব বোলো না। বড় ভয় করে।

মণিমালা : কিন্তু কেন ব্যর্থ, কেন ? কারণ জানেন
যেহেতু বাস্তব বুদ্ধি একেবারে নেই—
লোহার দরজা ; মিস্ত্রি ডেকে আনতে হয়।

সান্যাল : ব্যর্থ, যেহেতু অনিষ্ঠ,—
সার্থক হবার মতো যথেষ্ঠ শঠতা নেই, আমি
নীচতার পথ ধরে গৌরবের আসনে যাই না
মানুষ আমার কাছে মূল্যবান মানুষ হিসেবে।

মণিমালা : তাই কোনো মতে বেঁচে থেকে
বিশ্বাস পাহারা দিয়ে যান।
সে মানুষ আপনাকেই ভুলে গেছে। আপনি তো বিস্মৃত।

সান্যাল : দল আর কাগজের এক যোগে চেষ্টার ফলেই—

মল্লিকা : চলে যাবে ? যাও দেখি ! ভীতু কোথাকার।
**your eyes in which I voyage**
**Have given the movements of the roads**
**A direction detached from the earth**
তুমি ছাড়া আমার বাঁচার অন্য সার্থকতা নেই।

[ মণিমালা ও সান্যাল তাকালেন। ]

সান্যাল : আমার বিশ্বাস আছে কি ? জানি না। তবে
অবিশ্বাস করার মতন স্পর্ধা নেই
জীবনের ছোট ছোট সত্যগুলি নিয়ে দিন কাটে
আমি জীবন্মৃত। অস্থির বিপুল বিশ্বে আমি বোকা।
তোমাদের ওই ঘরে স্থিরতার প্রতীক দেখেছি।
ঠিকই, দেশের কাজে আমি গেছি

সমস্ত আবেগ নিয়ে
মানুষের ভালো হোক চেয়েছিও। সেখানে সংশয়—
তবে কি আমার পথ একান্ত অভ্রান্ত ? কে বলেছে ?
কিন্তু সব ভুলে গিয়ে কান ধরে ভালো করানোর মতো
হিংস্রতা ছিলো না। আমার মঙ্গল মানে মানুষের
সার্বিক মঙ্গল, এ কথা ভাবিনি। তাই ব্যর্থ আমি।

মণিমালা : সান্যাল মশাই

সান্যাল : আমার সংশয় আছে।
তবে উগ্রতা নেই।
হয়তো ক্ষমতা নেই, তাই।
আমি তুমি নও
দেশের কাজের মধ্যে দেশকে পাইনি
মনে হয় বিরাট ভাগাড়ে মরা গরু পড়ে আছে
কয়েকটা শেয়াল শকুন তাকে খাবলে খাবলে
ভাগাভাগি করে নিয়ে নরক জাগায়।

মল্লিকা : যেখানেই তুমি যাবে আমি সেখানেই
তুমি ছাড়া আমি অর্থহীন জানো না চন্দন।
বিয়ে ? হাসি পাচ্ছে ? হাসো ! মাথা পেতে আছি।
বিয়ে হয়েছিলো ঠিক। কোনো এক কালে।
ভীতু কোথাকার। ভীষণ, ভীষণ, ভীতু।

সান্যাল : তারপর বিপ্রদাস এলো
ওর সব কথা তখনও বুঝিনি
এখনও বুঝি না
তবে সে যথেষ্ট শক্তিমান বুদ্ধিদীপ্ত ছিলো
তাই তার আলোয় নিজেকে খুঁজতাম মনে মনে
অথবা তাকেই দেখতাম, তবে আচ্ছন্নতা ছিলো
তুমি বলো বিপ্রদাস তোমাকে ঠকালো
তুমি বলো বিপ্রদাস নিজের ছেলেকে হিংসে করে
যদি কোরে থাকে তবে তার বিচারের ভার
আমার ওপরে নেই। শ্যামল…শ্যামল

মণিমালা : চুপ, চুপ

সান্যাল : চলো না ও ঘরে যাই—
পরিষ্কার হওয়া দরকার
যাকে বলে—কনফেস্সান,

মণিমালা : কার সঙ্গে এত কথা বলে

সান্যাল : আড়ি পেতে শোনা নোংরা কাজ

মল্লিকা : চন্দন, চন্দন আমি কি করে থাকবো ?

মণিমালা : কে এই চন্দন জানো ?

সান্যাল : বিশ্বাসের কথা তুলে লাভ ?

মণিমালা : কে এই চন্দন জানো ?

মল্লিকা : কেন তুমি এলে তবে
আমি সব ভুলে শূন্যতাকে নিয়ে ভালোই ছিলাম
পায়ে পড়ি নিষ্ঠুর হয়ো না। চন্দন, চন্দন, শোনো—

সান্যাল : শ্যামল পালিয়ে গেলো।
বিপ্রদাস এক কথা বলেছিলো
তুমি বললে আর এক কথা
মল্লিকা হয়তো অন্য এক ভাষ্য দেবে
তাতে কি বা হলো
সত্য খুঁজে পাওয়া গেলো নাকি ?
কি সে সত্য ? হয়তো শ্যামলও ঠিক কারণ জানে না।

মণিমালা : মল্লিকা কাঁদছে

সান্যাল : মল্লিকা কাঁদছে ?

মল্লিকা : ভুল ; এত ভুল হতে পারে ?
ভালোবাসা অর্থহীন ?
আমি·· আমি···
আমি দাঁড়াবো কোথায় ?

সান্যাল : সত্যি ও দাঁড়াবে কোথায় ?
স্বামী নেই। তুমি মণিমালা
তুমিও প্রসন্ন নও
অথচ তোমাকে ও-ই এত কাল আগলে রেখেছে।

মণিমালা : মেয়েদের ধর্ম এই
শ্যামলের চেয়ে তার বাবাকে বরং
আগলানো সহজ ছিলো—তাই আমি
ছেলে ছেড়ে থাকতে পেয়েছি।
কে এই চন্দন জানো ?

মল্লিকা : তুমি ছাড়া কেউ নেই
কোনোদিন ছিলো না আমার
চন্দন ··চন্দন·· হ্যালো···হ্যালো···
যাক, সব গেলো, সব নিভে গেলো !
নোঙর ছিঁড়লো।
সমস্ত টলছে—
পড়ে গেলো ভেসে গেলো সব

[ মল্লিকা কেঁদে উঠলো। মুখ ঢাকলো। এগিয়ে গেলেন সান্যাল। মণিমালা যেখানে ছিলেন সেখানেই থাকলেন ]

সান্যাল : মা, মল্লিকা, কি হলো ? কি হলো ? বলো।

মণিমালা : বৌমা

সান্যাল : কি হলো তোমার ?

মণিমালা : কে ওই চন্দন ?

সান্যাল : আহা, থাক না এখন

মণিমালা : বৌমা, কে ওই চন্দন ?

সান্যাল : মল্লিকা, মল্লিকা, ওঠো, শ্যামল আসছে।

[ মল্লিকা মুখ তুলে তাকালো ]

আশ্চর্য ! তাই না ? সত্যি ! মিথ্যে কথা নয়
শ্যামল আসছে ··

মণিমালা : কে ওই চন্দন বৌমা

মল্লিকা : আমার যে দাঁড়াবার কোনো ঠাঁই নেই।

সান্যাল : কারো নেই মা মল্লিকা, কারো নেই
আমাদের পায়ের নিচের মাটি
রোজ ক্ষয়ে যাচ্ছে, যাক।

কি হয়েছে তাতে—

মণিমালা : কে ওই চন্দন

মল্লিকা : চন্দন আমার···চন্দন আমার···
আমি ওকে ভালোবাসি
শ্যামল যাবার পর ও এসে বোঝালো
যা আমি পাইনি
আর যা না পেয়ে ব্যর্থ
তার নাম—ভালোবাসা

সান্যাল : মল্লিকা!

মণিমালা : বৌমা!

মল্লিকা : ও নামে ডেকো না
আমি কোনোদিন তোমাদের বৌমা ছিলাম না।
কোনোদিন না, কোনোদিন না।
বিয়ে হলো, তবে মন যুক্ত হতে কখনও পারেনি।

সান্যাল : মল্লিকা মা

মল্লিকা : তাই কাকাবাবু।
কখনও কখনও অনুভব আসে সেই
পক্ষীরাজের মতন। স্বপ্ন হানে।
চন্দনও সে ভাবে এলো। তখন শ্যামল নিরুদ্দেশ।
চন্দনের মুখ ছাড়া অন্য মুখ কখনও ভাসেনি
আমাকে সে আবিষ্কার করে বললো : চোখে চোখ রাখো।

মণিমালা : চুপ করো
আমি আর শুনতে পারছি না
আমি কালা হয়ে গেছি
আমি ওই নিরেট দেওয়াল

মল্লিকা : আমি ওকে ঠকাতে চাইনি। চন্দন প্রচ্ছন্ন ছিলো
ছাই চাপা আগুনের মতো মাঝে মাঝে আমাকে পোড়াতো
কিন্তু সব চেপে, মুখ বন্ধ করে ছিলাম একলা
ছলনায় অভিনয়ে সব ফাঁক ভরিয়ে তবুও
শ্যামল জাগেনি তার পুরুষের অহংকার নিয়ে

শ্যামল নিজের মধ্যে ছিলো বন্দী গন্ধের মতন।
তখনই জেনেছি আমি বিছানার অন্য নাম চিতা
সারারাত জ্বলেছি কেবল। দেখেছি সে চোখ মেলে
শূন্যে চেয়ে আছে। দেখেছি সে শূন্যতায় ডুবে হিম
নিরুত্তাপ। পাশে তার পড়ে আছে অন্য হিম শব।
আমার মনের নিচে অন্ধকারে চন্দনের মুখ
দেখেছিলো সে কি? তাই চুপ করে সরে গেলো নিজে?

মণিমালা : আমি স্তব্ধ হয়ে যাই
আমি অন্ধ হয়ে যাই
কি নিষ্ঠুর কি নিষ্ঠুর তুই রে মল্লিকা!

সান্যাল : শ্যামল আসছে! শ্যামল আসছে আর
আজকেই এই সব…আশ্চর্য, আশ্চর্য!

মল্লিকা : আসুক শ্যামল। জানুক সে সব, সব
তাকে আমি নিশ্চয়ই জানাবো।
আমি ঠকাতে চাই না। কাকা, ঠকাবো না।
চন্দন তারই তো বন্ধু
চন্দন শ্যামল আমি একটা ত্রিভুজে
ঘুরে ঘুরে মরেছি আমরা।
মনে মনে পুড়েছি হয়তো।
সে কি বুঝে ছিলো তার হার হয়ে গেছে?
মনের গভীরে সে কি তাই দেখেছিলো?
যা ছিলো আমার অগোচরে
তা কি হলো তার কাছে
স্বচ্ছ দিনের আলোক?
সে কি বুঝলো যার মুখ হানা দেয়
তাই সে পালালো?
সে শ্যামল নয়, সে তো চন্দন, চন্দন!
এই তবে আসল কারণ?
ওই অন্ধকূপ নয়,
অভিমান নয়,

পরঞ্জয়
আসল কারণ ?
আসুক শ্যামল
ঘুচে যাক এ বাড়ির সব দায় ভার।

সান্যাল : আমাদের দাঁড়াবার কোনো ঠাঁই নেই

মণিমালা : এত অহংকার কিসের মল্লিকা ?
ভাবছো আমরা সব মিথ্যে বলে···
এই নাও টেলিগ্রাম নাও, পড়ো।

মল্লিকা : কি হবে ? থাক না।
দেখি···দাও···

সান্যাল : আমাদের দাঁড়াবার কোনো ঠাঁই নেই

মণিমালা : এবার মল্লিকা

মল্লিকা : কার টেলিগ্রাম ?

সান্যাল : শ্যামলের।

মল্লিকা : কবে পেয়েছেন ?

সান্যাল : কবে মণিমালা ?

মণিমালা : কাল রাতে

মল্লিকা : কাল রাতে ?

মণিমালা : বিশ্বাস হচ্ছে না ?
অক্ষর ভুলেছো নাকি ?

মল্লিকা : আশ্চর্য !

মণিমালা : কেন ?

সান্যাল : আমাদের দাঁড়াবার কোনো ঠাঁই নেই

মল্লিকা : মা, ভাবতাম আমাকে
তোমার দরকার খুব
আমারও দরকার ছিলো
আমারও মনের কোণে
অপরাধ বোধ ছিলো, তাই
এখানে থাকতাম
শ্যামলের হয়ে তোমাকে দেখতাম।

জানি তুমি কোনোদিন
আমাকে কাছের লোক বলে
ভুলেও ভাবোনি।
তবুও থেকেছি।
আর অন্য কারণ ছিলো না
আমি তো জড়িত নই—
না তোমাতে, না ওই ভুতুড়ে ঘরে।
শ্যামলের নিয়তিতে হয়তো একটু
আমার দায়িত্ব ছিলো।
আমার অস্তিত্ব অনুভব কখনো করেনি কেউ
আজকে তোমার কাছে আমি অর্থহীন।
এখন যাওয়াই ভালো।
আমি চলে যাবো।

মণিমালা : শ্যামল আসুক, তাকে বলে যেও

মল্লিকা : শ্যামল আসছে না

সান্যাল : শ্যামল আসছে না ?

মল্লিকা : শ্যামল আসছে না

মণিমালা : আর এই টেলিগ্রাম ?

সান্যাল : কি বলছো মল্লিকা ?

মল্লিকা : ন বছর আগে
হয়তো আমাকে টেলিগ্রাম করেছিলো
ন বছর আগে।

সান্যাল : পুরনো কাগজ—পুরনো কাগজ মাত্র।
কই দেখি, দাও

[ সান্যাল টেলিগ্রাম নিলেন ]

মল্লিকা : কোথায় পেলেন ?

মণিমালা : খাটের ওপরে।

মল্লিকা : খোলা ?

মণিমালা : শ্যামল আসছে না !

সান্যাল : শ্যামল আসছে না

পঞ্চান্ন সালের এক টেলিগ্রাম মণি
শ্যামল আসছে না।
অনেক পুরনো—তবু নতুনের মতো।

মণিমালা : আমাদের দাঁড়াবার কোনো ঠাঁই নেই

মল্লিকা : আমারই বাক্‌সে ছিলো
কাল বার করে রাখতে ভুলে গেছি
হয়তো নন্দর মা
ঝাঁট দিতে গিয়ে ওটা ওখানে রেখেছে।

মণিমালা : শ্যামল আসছে না

সান্যাল : বিপ্রদাস তোমাকে ঠকালো
বন্ধ ঘর অন্ধকার ছায়া দিয়ে হলো না তো বট
আঁকড়ে রাখার আর কোনো কিছু নেই।

মণিমালা : আমাদের দাঁড়াবার কোনো ঠাঁই নেই

মল্লিকা : চন্দন চন্দন ছিলো
তাও মুছে গেলো।
মা আমি নিষ্ঠুর নই, ভাগ্যই নিষ্ঠুর
নিষ্ঠুর চন্দন—যে আমাকে
জাগিয়ে পালালো ক্লীব ভীরুর মতন।

সান্যাল : আমরা সবাই যেন ফাঁদে পড়া জানোয়ার, যেন
বিফল হাত পা নেড়ে আরও জট পাকিয়ে তুললাম

মণিমালা : এবার আমাকে করো পাথরের নিরেট দেওয়াল।

মল্লিকা : আমরা বালির তটে রেখা কেটে যাবো
কীর্তিনাশা ঢেউ এসে সব—সব মুছে দেবে।

[ তিন জন তিন দিকে ছিটকে আছে। এমন সময় নন্দর মা চায়ের সরঞ্জাম টেবিলে রাখলো। তাকে বিব্রত দেখাচ্ছে। রোদ এসে পড়েছে বন্ধ ঘরের দরজার ওপর। অতিকায় দেখাচ্ছে দরজাটাকে। নন্দর মা চায়ের পাত্র সাজালো। সান্যাল টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন। ]

**কৃষ্ণ ধর**

## বধ্যভূমিতে বাসর

[ পর্দা উঠলেই দেখা যাবে এক স্তব্ধ জনতা। ঘর ফিরতি মানুষ সব। নর ও নারী। সারাদিনের কর্মক্লান্তির ছাপ রয়েছে চোখে মুখে। মঞ্চের এক কোণে জ্বলছে লাল আলো। সন্ধ্যার আকাশের অপস্যমান আলোকবিন্দু যেন। জনতার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে একটি লোক কথা বলছে। ]

পরমেশ্বর : কথা কও, কই হে বাপের সুপুত্রগণ, কই গো সতী রমণীর স্বামীরা
একবার মুখ খুলছো না কেন ? সব চুপচাপ
কথা কও, এই স্তব্ধতা ভাঙো, চুরমার করো এই
দুঃসহ নৈঃশব্দ্য
এই তো এতক্ষণ বেশ ছিলে পোষা পাখির মতন
সরব, কলকণ্ঠ আনন্দে আত্মহারা
এখন সব চুপ কেন ? কথা কও
বাপের সুপুত্রগণ আর তোমরা, সতী রমণীর স্বামীরা।

[ জনতার মধ্যে চাপা গুঞ্জন। এই তিরস্কার তাদের শুনতে ভালো লাগছে না। অথচ কোথায় যেন সত্য আছে। জনতার মধ্যে থেকে একজন জবাব দিলো ]

গুপী : বেতাল কথা কইছো কেন পরমেশ্বর
তুমি কি আমাদের রক্ষক ? প্রতিপালক ? অভিভাবক ?
[ জনতার ভেতর থেকে সায় আসে : ঠিক ঠিক ]
যদি তোমার কিছু বলার থাকে বলো ভালোভাবে
অমন বাচালের মতো যা তা কথা কয়ো না
আমাদের বড় শোক,
বিশাল দুঃখ আমাদের পরমেশ্বর
আমাদের আর দাগা দিয়ো না হে,
আমাদের বাড়ি ফিরতে দাও, আমরা বড় ক্লান্ত।

পরমেশ্বর : হা হা হা হা
আমার দমক শুনেছো হাসির ?
হা হা হা হা

এ হাসি জমা ছিলো তোমাদের তরে, শোনো গুপী
আমি তোমাদের রক্ষক হতে যাবো কেন ?
প্রতিপালক হবার কোনো ইচ্ছাও নেই
তোমাদের অভিভাবক তোমাদের অন্নদাতা
এই মহাযন্ত্রশালার অধিপতি কর্মেশ্বর
তোমরা তো নিশ্চিন্ত।

অনন্তরাম : তুমি পরিহাস করছো পরমেশ্বর
আমাদের নিশ্চিতি কোথায় ? সে কি তোমার অজানা ?
আমাদের শোকের দিনে তোমার এই বিকৃত পরিহাস
ছুরিকাঘাতের মতো বিঁধছে
কি নিষ্ঠুর তুমি পরমেশ্বর
তোমার রক্তে কি পিতৃপুরুষের কোনো ঋণ নেই
তুমি কি নির্মম আমাদের বিধাতার মতো ?

পরমেশ্বর : তুমি ভুল করেছো অনন্তরাম, আমি নির্মম নই
আমি বিধাতাও নই···বিধাতা তোমাদের কর্মেশ্বর
এই শোকের ঘটনার চরম দায়িত্ব যাকে বইতে হবে
তোমরা পোষা পাখির মতো দানা খেয়ে চুপ করে আছো
তাই দরকার ছিলো এই চাবুকের
তোমরা কিছু বলো, অনন্তরাম, গুপী
তোমরা কিছু বলো, এই মৃত্যুর নৈঃশব্দ্য ভাঙো
আনন্দ কাল রাত্রে মারা গেছে।

[ 'আনন্দ মারা গেছে' 'মারা গেছে' ইত্যাদি অস্ফুট শব্দ ক্রন্দনের মতো, বোবা প্রার্থনার মতো উঠতে থাকে জনতার মধ্যে থেকে ]

আমাকে তোমরা কাঁদতে দাও,
তোমরা কাঁদো সবাই।

[ সেই অস্ফুট কান্নার ভেতর থেকে শোনা যায় এক নারী কণ্ঠ ]

লাবণ্যময়ী : না, আমরা কাঁদবো না

[ সকলে তাকায় সেই শোকস্তব্ধ উজ্জ্বল রমণীর দিকে ]

আর কান্না নয়
আমাদের চোখের জল সব শুকিয়ে গেছে

আমাদের কান্নায় আর আনন্দ ফিরবে না।

[ 'আর আনন্দ ফিরবে না' 'ফিরবে না' ইত্যাদি শব্দ ওঠে জনতার ভেতর থেকে ]

আমরা যাকে ভালোবাসতে চাই তাকেই আমরা হারাই
আমরা কখনো মা হতে পারি না
আমরা চিরকালের বন্ধ্যা
আমরা কখনো প্রেমিকা হতে পারি না
আমরা চিরকালের পতিতা
আমরা অনন্তকালের জন্য নরকে বাস করছি
আমাদের কোনো প্রত্যাশা নেই, ভয়ও নেই
প্রেম নয়, আমরা চাই শুধু ঘৃণা
আরো ঘৃণা, শুদ্ধ পবিত্র ঘৃণা।

[ গুঞ্জন বাড়ে। রমণীরা চঞ্চল হয়, পুরুষেরা বিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করে এই উজ্জ্বল রমণীর দিকে ]

পরমেশ্বর : তুমি ?
তুমি এখানে কেন লাবণ্যময়ী ?
এখানে পুরুষ ও রমণীরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট
কেহ মাতা, কেহ প্রেমিকা, কেহ কন্যা, কেহ বা পিতা
তুমি এখানে খুবই বেমানান
তুমি বহিরাগত…আগন্তুক।

লাবণ্যময়ী : বহিরাগত ? আগন্তুক ?
খুব কথা শিখেছো পরমেশ্বর
তোমার মতো বহু পুরুষ আমাকে যাচ্ঞা করে ফিরে যায়।

[ জনতা থেকে ছি; ছিঃ শব্দ ওঠে। 'এসব কি কথা হচ্ছে' বলে কেউ কেউ ]

ছি ছি করার কিছু নেই
আজ রাখঢাক করেও কিছু বলবো না
যা সত্য, যা অনিবার্য তাই আজ বলতে হবে
আমি এই কর্মনগরীর বহু বাঞ্ছিতা এক নারী…পতিতা
আমি পাপের ভিতরে আছি, তাই পুণ্যকে এড়িয়ে চলি
তোমাদের এই পরমেশ্বরের মতো আড়ম্বরে করি না বিশ্বাস
আমি তৃষ্ণার্তকে দিই পরিতৃপ্তি, ক্ষুধার্তকে দিই আরাম

এর কোনো বিকল্প নেই
আমরাই অনাদিকালের আশ্রয়
তৃষ্ণার্তের ক্ষুধার্তের আমরাই অনাদি নারী।
গুপী : ওসব হেঁয়ালি আমরা বুঝি না গো নারী
আমাদের ঘর সংসার আছে···আমরা পতিতালয়ে যাই না
অনন্তরাম : নিশ্চয় নিশ্চয়
আমরা কোনোদিন তোমাকে যাঞ্চা করিনি।
আমরা ঘর আর কারখানা, কারখানা আর ঘর
এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ চিনি না।
লাবণ্যময়ী : এবার চিনতে হবে গুপী অনন্তরাম
গুপী ও অনন্তরাম : আমাদের নাম জানলো কি করে
বড়ই আশ্চর্য!
লাবণ্যময়ী : আশ্চর্যের কিছু নয়
আমাদের সব জানতে হয়
আমরা যে বারনারী!
পরমেশ্বর : কেন এখানে এসেছো লাবণ্যময়ী?
তুমি কি জানো না এদের মনের মহাশোক
গভীর বিষাদে লিপ্ত ইহাদের ক্ষণিক জীবন?
লাবণ্যময়ী : ওই আকাশের জলন্ত নক্ষত্রের দিকে একবার তাকাও
সহস্রযুগের শোকাগ্নি বুকে করে জ্বলছে অনন্তকাল
ওই ছাখো, কত কালের মানুষ ওর দিকে তাকিয়ে চলেছে
পশ্চিম দিগন্ত হতে পুবের দিকে
রাত্রির অন্ধকার অঞ্জলির পর সকালের দিকে
ছাখো, ছাখো

[কই কই দেখি দেখি—বলে সব লোক, স্ত্রী পুরুষ জনতা সব আকাশের দিকে তাকায়, একমাত্র পরমেশ্বর ছাড়া। সে তাকিয়ে আছে লাবণ্যময়ীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে]

লাবণ্যময়ী : কি দেখছো পরমেশ্বর?
পরমেশ্বর : আমি তোমার চোখদুটো দেখছি লাবণ্যময়ী।
লাবণ্যময়ী : আমি তোমার সখি নই পরমেশ্বর
ওভাবে কথা বোলো না তুমি

পরমেশ্বর : [ প্রচণ্ড হাস্য করে ]
হা হা হা হা শোনো শোনো শোনো তোমরা
লাবণ্যময়ী বলছেন—
[ কি বলছেন ? কি বলছেন ? ইত্যাদি শব্দ জনতা থেকে
বলছেন লাবণ্যময়ী : আমি তোমার সখি নই পরমেশ্বর
ওভাবে কথা বে'লো না তুমি
হা হা হা হা [ একটু থেমে ]
আমি বলি, তুমি তবে কার সখি লাবণ্যময়ী ?
তুমি কিসের জন্য এসেছো এখানে
মানুষের সর্বনাশা শোকের মাঝখানে ?

লাবণ্যময়ী : তুমি আমাকে অপমান করছো পবমেশ্বর
আমি জানি তোমার সৌজন্যের সীমা।

অনন্তরাম : যথার্থ বলেছো তুমি নারী,
পরমেশ্বর আমাদের বিদ্রূপে জর্জরিত করছে
আমাদের হৃদয়ে মহাশোক।

গুপী : আমরা কতদিন ভোরের আলো দেখিনি।

অনন্তরাম : আমরা কতদিন নদীতে যাইনি।

সমবেতকণ্ঠে : আমরা এখানে বন্দীর জীবনযাপন করছি
আমরা বেরোবার পথ জানিনে।

পরমেশ্বর : তোমরা সব নির্বোধ, নিরেট, বোকা
তোমাদের মাথায় কি সার পদার্থ আছে ?

সমবেতকণ্ঠে : কেন ? কেন ? কেন ?
তুমি কি নিজেকে সবার চেয়ে বুদ্ধিমান মনে করো ?

লাবণ্যময়ী : তুমি কি সবাইকে উপহাসের পাত্র মনে করো ?
[ পরমেশ্বর সকলের দিকে তাকায়। তার চোখে মুখে এবার যেন বিষাদের ছায়া নামে ]

পরমেশ্বর : তোমরা ভুল করছো।
আমি নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করিনে,
উপহাসও আমার অস্ত্র নয়
আমি তোমাদের এই আচ্ছন্ন বিষাদ থেকে মুক্ত করতে চাই
আমরা মুক্তি চাই।

সমবেতকণ্ঠে : আমরা সকলেই মুক্তি চাই।

লাবণ্যময়ী : কিসের সে মহাশোক ?
আনন্দের মৃত্যু ? কোন নক্ষত্রের আলোয়
উদ্ভাসিত সে মহামৌন বিপন্ন বিষাদ ?

পরমেশ্বর : আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব, আমাদের বিবেক লাবণ্যময়ী
আমাদের বিক্রীত বিবেক।

সমবেতকণ্ঠে : আমরা শয়তানের কাছে বন্ধক দিয়েছি আত্মা
আমরা নিজেকে নিজেরা চিনতে পারি না।

[ দূরে কারখানার বাঁশি বাজে···মোটরের হর্ণ,টাকার শব্দ ইত্যাদি প্রতীকী ব্যবহার ]

ওই ওই শয়তানের কণ্ঠস্বর, শিস দেয় ভৌতিক ইঙ্গিতে
নিশির ডাকের মতো, এইবার অন্যসব নরনারী
যে যেখানে আছে চলে যাবে শয়তানের কাছে

পরমেশ্বর : এ যন্ত্রশালায় মানুষ মারার যন্ত্র তৈরি হয় লাবণ্যময়ী
যেখানে যত সংঘর্ষ, রক্তপাত
সর্বত্র এই অস্ত্রের যাতায়াত

অনন্তরাম : ভীষণ রক্তপাত, চতুর্দিকে অজস্র রক্তের বন্যা
অশ্রুপাত বহে যায় প্রপাতের মতো
মানুষের হাতে রক্ত···মানুষের হৃদয়ের কাছে
হৃদয়ের কোনো মূল্য নেই।

গুপী : আমরা নরকে আছি শয়তানের ক্রীতদাস হয়ে
আমাদের মুক্তি নেই।

পরমেশ্বর : লাবণ্যময়ী, তুমি এদের দিকে তাকাও
সকলেরই এক মুখ, এক বেশ, যেন অটোমেশন
আত্মাহীন পুতুলের মতো, স্বয়ংক্রিয়
কথা বলে, মাথা নাড়ে, হাসিকান্না সব কিছু আছে
শুধু নেই মানুষের স্বাধীন বিবেক এবং স্বাধীন চিন্তা।

লাবণ্যময়ী : আকাশের দিকে তাকাও গুপী, অনন্তরাম,
তাকাও পরমেশ্বর ,
নক্ষত্রের অনন্তবীথি পড়ে আছে মুক্তার মালার মতো
দীপ্ত চোখ তারকার, দেখে মনে হয় যেন চেয়ে আছে

আমাদেরই দিকে,
আমাদের লক্ষ্য ওইখানে, আমাদের আশা
মানুষ চিরকালের স্বাধীন, তার কোনো বন্ধন নেই।

পরমেশ্বর : তুমি আকাশের দিকে কি দেখাচ্ছো লাবণ্যময়ী
স্বপ্নের ফানুস ?
তার কোনো শিকড় পাবে না খুঁজে
আমাদের শিকড় মাটিতে, তাকে তুমি আলগা কোরো না।

[ দূরে ঘণ্টা বাজতে থাকে, বাজতে থাকে, বাজতে থাকে। মানুষগুলো নিষ্প্রভ চোখে পরস্পরের দিকে তাকায়। যাবার জন্যে উসখুস করে ]

অনন্তরাম : আমরা তাহলে যাই পরমেশ্বর
আমাদের যাবার ঘণ্টা বাজতে সুরু করেছে।

গুপী : আমরা যেন সেই হ্যামলিনের ইঁদুরের মতো
বাঁশির শব্দ শুনলেই পিছন পিছন ছুটি।

কোনো তৃতীয় কণ্ঠ : যেন এক অন্ধ নিয়তি
বেঁচে থাকাটাই আমাদের দণ্ড
বেঁচে থাকার কি অসহনীয় ক্লেশ
মৃত্যুই আমাদের মুক্তি লাবণ্যময়ী।

পরমেশ্বর : চুপ করো হতভাগার দল
দার্শনিকের মতো কথা বলতে শিখেছো।

[ হঠাৎ গায়ের জামা খুলে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। সবাই আঁৎকে শব্দ করে ওঠে। একটা গভীর ক্ষতের দাগ ]

মনে আছে তোমাদের গুপী ? মনে আছে অনন্তরাম ?
তোমাদের বাঁচাতে গিয়ে একদিন মিলে ছিলে।
এই চাবুকের ঘা।

সমবেতকণ্ঠে : মনে আছে পরমেশ্বর,
সেই শয়তানকে আমরা এবার টুকরো টুকরো করবো
তুমি শুধু বলে দাও, কে সেই শয়তান ?

পরমেশ্বর : যে আমাদের বিবেকের ওপর প্রভুত্ব করছে
সেই শয়তান।

লাবণ্যময়ী : তুমি অমন বক্তৃতার ভাষায় কথা বোলো না পরমেশ্বর
এ দংশন শুধু তোমার নয়

আমাদের সমসাময়িকতা এর দ্বারা কলুষিত
তোমাদের গেছে বিবেক, আমাদের যাচ্ছে দেহ।

[ কে যেন "ধিক ধিক" করে উঠলো ]

তোমাদের লজ্জা করা উচিত
বিবেক বিক্রয় করলে হয় শোক
দেহ বিক্রয় করলে বলো, ধিক ধিক।

পরমেশ্বর : উভয়েই শোকের বিষয়
আমরা শোকাহত লাবণ্যময়ী
এসো আমরা সেই শোকের উৎসের দিকে যাই।

গুপী : উৎসে যেতে হলে আমাদের নীরব হতে হবে
আমাদের মুখরতা সেই শোকের নিদ্রা ভেঙে দেবে পরমেশ্বর।

অনন্তরাম : চুপ কর তুই গুপী,
তুইও দার্শনিক হয়ে উঠলি।

লাবণ্যময়ী : তোমরা ঝগড়া কোরো না গুপী, অনন্তরাম
পরমেশ্বর আমাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে।

[ সবাই যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। মানুষগুলিকে সেই অদ্ভুত আঁধারে বিস্ময়কর মনে হবে আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ। ধীরে ধীরে প্রলম্বিত হয় এক ছায়া। প্রবল অট্টহাস্যে স্তব্ধতা খান খান করে এক রহস্যময় মূর্তির আবির্ভাব। চেহারা ভীতিপ্রদ, সে নিষ্ঠুর জল্লাদ ]

সকলে : ওই ওই সেই শয়তান,
পরমেশ্বর, তুমি আমাদের রক্ষা করো
লাবণ্যময়ী তুমি সরো শয়তানের কাছ থেকে।

জল্লাদ : আমি শয়তান নই মুর্খ নির্বোধের দল
আমি জল্লাদ
হত্যা করা আমার পেশা
আমি দোষগুণ বিচার করি না
আমি হুকুমের দাস।

সকলে : কে তোমাকে চালনা করে ?

জল্লাদ : জানি না···আমি তাকে কোনোদিন দেখিনি।

সকলে : তুমি তার হুকুম মানো কেন ?

জল্লাদ : আমি তার ক্রীতদাস।

সকলে : ক্রীতদাস ? আমাদেরই মতো।

জল্লাদ : না, তোমাদের মতো নয়।
তোমরা নিহত হও, আমি নিহত করি
মরা ও মারার মধ্যে যে তফাৎ
তোমাদের আর আমার মধ্যে সেই ব্যবধান
হা হা হা হা।

লাবণ্যময়ী : হাসি থামাও, বলবান মূর্খ।

জল্লাদ : কে ? কে বললে ওই কথা ?
কার এত আস্পর্দ্ধা ?

[ একটা বাচ্চা ছেলে কেঁদে ওঠে। 'আমি মার কাছে যাবো' 'আমার ভয় করছে' ইত্যাদি শব্দ ]

কেউ যেতে পারবে না।
আজ তোমাদের সকলকে নিয়ে যাবো।

সকলে : কোথায় ? কোথায় নিয়ে যাবে।

জল্লাদ : যেখানে সবাই যায়—বধ্যভূমিতে।

[ জনতা থেকে আর্তনাদের শব্দ। আলো নিভে যায়। জল্লাদ মুখে অদ্ভুত শব্দ করে। সেই অন্ধকার, ত্রস্ততা, কি ঘটছে কিছুই বোঝা যায় না। ]

২

[ অন্ধকার মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হলে দেখা যায় সেই জায়গাটিই একটি কারাগারের চেহারা নিয়েছে। উঁচুতে একটি জানলা। সামান্য একটু আকাশ দেখা যায় এই পর্যন্ত। একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়। আলো পরিষ্কার হতে থাকলে পরিচিত মুখগুলি ভাসতে থাকে ···শুধু পরমেশ্বর আর লাবণ্যময়ীকে ছাড়া ]

কণ্ঠস্বর : এইখানে তোমাদের নিয়তি অন্ধকার নিয়তি
মৃত্যুর মতো নিশ্চিত, দয়াহীন দণ্ডের মতো অনিবার্য
তোমাদের বিক্ষোভ শুধু নিষ্ফল হাহাকার
তোমরা শুধু কাঁদতে জানো,
প্রতিবাদের অন্য ভাষা তোমাদের অনায়ত্ত
এইখানে তোমাদের নিয়তি
এইখানে উজ্জ্বল নিষ্করুণ বধ্যভূমি।

[ চাপা গুঞ্জন উঠবে। মানুষগুলো ভয়ার্ত জন্তুর মতো বোবা চোখে পরস্পরের দিকে তাকাবে। কিছু যেন ঠাহর করতে পারে না। গুঞ্জন ক্রমশ উঁচু গ্রামে ওঠে ]

কণ্ঠস্বর : তোমরা এই বধ্যভূমির শিকার
তোমাদের ব্যবহারে কোনো জীবনের প্রতীতি নেই
তোমরা আকাশের রঙফেরা দেখতে পাও না
তোমরা চিরকালের অন্ধকারে আত্মসমর্পিত
এইখানেই তোমাদের অন্ধকার নিয়তি।

[ বলতে বলতে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়। একই কথা উচ্চারণ করতে করতে। জানলার ওপর আলো পড়ে। একটা পলাশ বা শিমুলের রক্তসজ্জায় দিগন্ত যেন উজ্জ্বল ]

গুপী : ওই দ্যাখো দ্যাখো, দিগন্তে আগুন জ্বলছে
এখন বোধহয় ফালগুনের হাওয়া বইতে সুরু করেছে অনন্তরাম
দ্যাখো দ্যাখো।

অনন্তরাম : আমাকে আর ওই নামে ডেকো না গুপী
আমি আর ওই মানুষ নই
আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি।

গুপী : কি যা তা বলছো অনন্তরাম,
দ্যাখো দ্যাখো দিগন্তে আগুন জ্বলছে
হাওয়া বইতে সুরু করেছে ফালগুনের
তার মানে···তার মানে
এই সময় রুক্মিণী নদীতে জল আনতে যাবে···
রুক্মিণী, রুক্মিণী আমি আসছি।

[ দরজার দিকে এগিয়ে ঝম ঝম করে আছাড় খেয়ে পড়ে ]

অনন্তরাম : আমাদের কোনো দিগন্ত নেই···
আমরা খুঁজি কোনো ফালগুনের ফেরারী বাতাস
আমাদের নিয়ন্ত্রণ কোরে নিয়ে চলেছে অন্ধ নিয়তি
বধ্যভূমির দিকে
তুমি কোথায় হে নিশ্চিত জল্লাদ,
তোমার শাণিত কথাগুলো বিশ্বাস করতে মন সরে না
অবিশ্বাস করবো এমন সাহস নেই।

গুপী : তোমার ওই অন্ধকারের জামাটা দেখলে
আমার সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে জল্লাদ

আমি যে-রাত্রিতে পথ হারিয়ে চলে এসেছিলাম এখানে
রুক্মিণী তখনও ঘুমোচ্ছিলো
ওর চোখে মুখে ছিলো গভীর প্রশান্তি, আশ্রয়ের নিশ্চিত সান্ত্বনা
ক্লান্ত পাখির মতো গাছের শাখায়
সেই রাত্রি আমাকে যেন নিশির ডাকের মতো টেনে নিয়ে এলো
এইখানে···আত্মবিক্রয়ের ফাঁদে।

[ একটা কান্নার মতো শব্দ ওঠে। আবার সেন মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে শুধু জানলার ভেতর দিয়ে আগুন-রাঙা আকাশ আর শিমুলের ডাল দেখা যায় ]

কণ্ঠস্বর : এইখানেই তোমাদের অন্ধকার নিয়তি
এবং আমারও
তোমরা নিহত হও, আমি নিহত করি
হা হা হা হা
ভয় পাচ্ছো নাকি তোমরা ? ক্লান্ত মানুষের দল।

সকলে : হ্যা গো। আমাদের বড় ভয়
আমরা শয়তানের কাছে বিক্রয় করেছি বিবেক
আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি নিজেদের মারণাস্ত্র
তাই দেখিয়ে তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছো জল্লাদ
তুমি নিষ্ঠুর, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি অবিবেচক।

কণ্ঠস্বর : হা হা হা হা
জল্লাদ নই, জল্লাদের অনুচর
আমি তার অস্ত্র বহন করি, তাতে শাণ দিই
আমিও পরাধীন তোমাদের মতো
আমিও আত্মবিক্রয় করেছি শয়তানের কাছে
আমি তাই শয়তানের চেয়ে শয়তান।

গুপী : তুমি দলত্যাগ করে আমাদের দিকে চলে এসো
তোমার হাতে আছে অস্ত্র
এসো সে অস্ত্র নিয়ে এই বন্দীশালা খান খান করি

অনন্তরাম : বৃহত্তর বন্দীশালায় প্রবেশ করার জন্য ?
ও কথা চিন্তাও করো না গুপী
তার চেয়ে এখান থেকেই শেষবারের মতো

দিগন্তকে দেখি।

কণ্ঠস্বর : বেশ দার্শনিকের মতো কথা বলছো তুমি
আমাদের প্রভু কি বলেন জানো ?
তিনি বলেন, দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে মানুষকে
প্রতারণার জন্য
তোমরা জানো না কিভাবে প্রতারিত হচ্ছো তোমরা।
তোমাদের জন্য করুণা হয়।

[ খানিকক্ষণ স্তব্ধতা। দূর থেকে করুণ সুরে বাঁশির আওয়াজ আসছে। ঝনঝন্ করে দরজা খোলার শব্দ হয়। দরজা খুললে গভীরতর অলিন্দ চোখে পড়ে যেখান দিয়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় আসছে পরমেশ্বর। তার পাশে শোকমূর্তির মতো লাবণ্যময়ী ]

সকলে : ওই ওই আমাদের সঙ্গী পরমেশ্বর
ওই আমাদের প্রিয় সখি লাবণ্যময়ী

গুপী : পরমেশ্বর তোমাকে সেদিন কটুকথা বলেছিলাম
তুমি আমাদের মার্জনা করো
আমরা এখানে শবের মতো কফনে ঢাকা পড়ে আছি
তুমি আমাদের উদ্ধার করো পরমেশ্বর ··

অনন্তরাম : লাবণ্যময়ী তোমাকে সবটুকু জানি না
শুধু জানি তোমার হৃদয়ে অনেক ভালোবাসা
তার রঙ ওই পলাশের মতো দিগন্ত উজ্জ্বল করা
তোমার ভালোবাসার অবিরল নির্ঝরে আমাদের ধুইয়ে দাও
আমরা বড় তৃষ্ণার্ত।

[ জল্লাদের প্রবেশ। পরমেশ্বর ও লাবণ্যময়ীর দিকে ]

জল্লাদ : তোমরা আজ রাত্রি এখানেই অপেক্ষা করবে
তোমাদের অপরাধ গুরুতর
কর্মেশ্বরের এই যন্ত্রশালায় অসন্তোষ ক্ষেপিয়ে তুলেছো
এই বোবা মানুষগুলির মুখে দিয়েছো কথা
আমাদের স্তব্ধতার রাজ্যে এনেছো মুখরতা
কর্মেশ্বর নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারেন না
তোমরা দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হও।

সকলে : ওহো ওহো
কি নিদারুণ নিষ্ঠুরতা !

জল্লাদ : [ কাল্পনিক তলোয়ারে যেন শাণ দিচ্ছে ]
মসৃণ, অতীব সুমসৃণ, তৃষিত হয়ে আছে কতদিন
আমি ভুল করিনি কিছুই···
এ কর্মেশ্বরের আদেশ
তোমাদের জ্বালায় কতদিন তিনি ঘুমুতে পারেননি।
তোমরা দণ্ডের জন্যে প্রস্তুত হও।

[ সর্বত্র একটা চাপা গুঞ্জন। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। শিকলের শব্দ হয়। শুধু স্থির নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পরমেশ্বর ]

লাবণ্যময়ী : ও তরবারি কোনো কাজেই লাগবে না।
হাজার মানুষের শিকল যদি এক সঙ্গে ঝন্ ঝন্ করে ওঠে
তোমার তরবারি তাকে ঠেকাতে পারবে না।

জল্লাদ : কে গো বউ তুমি ? বিদ্রোহের সুরে কথা কও
দেখি দেখি

[ কাছে গিয়ে ভালো করে নিরীক্ষণ করে ]

কে গো বউ তুমি ? গলায় যুঁইফুলের মালা
কপালে কুমকুমের টীপ···মুখখানা তো বেশ
কারো নাগরী ছিলে বুঝি তুমি ?

গুপী : চুপ করো নিষ্ঠুর জল্লাদ
ও আমাদের লাবণ্যময়ী
আমাদের সখী এবং মাতা যাই বলো তুমি।

জল্লাদ : সখী এবং মাতা ! হা হা হা
এও কখনো হয় বেজন্মার দল ?
এও কখনো হয় বেজন্মার দল ?
শুধু সখি বলতে বাধে কেন ? তবে সঙ্গে অনুসর্গ মাতা !
থুঃ থুঃ থুঃ, তোমরা আমাকেও ঘেন্না ধরালে হতভাগার দল

[ দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যায়। জনতার মধ্যে থেকে শোনা যায় বিদ্রূপের ধ্বনি ]

লাবণ্যময়ী : পরমেশ্বর।

পরমেশ্বর : কি লাবণ্যময়ী ? আমাকে আবার ডাকছো কেন ?
লাবণ্যময়ী : একবার দ্যাখো ওরা সব তোমার জন্য
অপেক্ষা করে আছে। এরা তোমার অনুগত
গুপী, অনন্তরাম ও অন্যান্য সবাই
হাতে ওদের শিকল তোমার মতোই
ওরা আজ অসহায়,
ওদের দিকে তুমি তাকাও।
গুপী : পরমেশ্বর, আমরা সব যুথবদ্ধ হয়ে
নিহত হবার জন্য সর্বনাশের প্রতীক্ষা করছি।
এই বধ্যভূমি থেকে বেরোবার পথ দেখাও তুমি
তুমি আমাদের বন্ধু, আমাদের সহযাত্রী।
অনন্তরাম : আমরা শিকল ভাঙতে পারি পরমেশ্বর,
সে বিদ্যা আমাদের জানা
কিন্তু এই বিরাট কারাগারের দরজা
ভাঙবো কি করে জানি না।
গুপী : বাইরে ফাল্গুনের মদির বাতাস বইছে।
আমার মনে পড়ছে রুক্মিণীব কথা।
রুক্মিণীকে ভুলিয়ে আমি চলে এসেছিলাম এখানে
কর্মেশ্বরের শয়তানী যন্ত্রশালায়
দুমুঠো অন্নের আশায়···
আমার রুক্মিণী···।
পরমেশ্বর : আমি তোমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলতে এসেছিলাম
কিন্তু আমাকে বন্দী করেছে কর্মেশ্বরের অনুচর।
তোমাদের আর আমার একই দশা
আমার পিঠে চাবুকের দাগ, হাতে শিকল
লাবণ্যময়ী জানে এ শিকলে নূপুরের শিঞ্জন ওঠে না পদে পদে
অন্ধকারের হিংস্রতা জ্বলে ওঠে ঘর্ষণে ঘর্ষণে,
আমরা সে আগুনে জ্বলতে থাকি,
আমি, তুমি, সে, সবাই
বাইরে পলাশের ডালে আগুন, ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে দিগন্তের

বনে বনে কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায়
আমাদের অস্তিত্বে আগুন
তোমরা একবার জ্বলে ওঠো
জ্বলে ওঠে গুপী অনন্তরাম
এতদিন চুপ করে সয়েছো নির্যাতন
আজ তার ফল ভোগ করতেই হবে।

লাবণ্যময়ী : ওরা অসহায়, কিন্তু মূঢ় নয়
ওদের তুমি বিদ্রূপ কোরো না পরমেশ্বর।
এই অন্ধকারে ওদের কেটেছে দীর্ঘদিন
তবু ওরা মনে রেখেছে আলোকের কথা, আকাশের কথা।

গুপী : আমরা কিছুই ভুলিনি লাবণ্যময়ী
তুমি তো জানো,
আমাদের হৃদয়ে ছিলো মহাশোক।

অনন্তরাম : আমরা কান্না দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি শোক
পরমেশ্বর, তুমি একদিন কাঁদতে চেয়েছিলে
আজ আমাদের ভর্ৎসনা করছো কেন ?
তুমি আমাদের জন্য কিছু করতে না পারো তো
অশ্রু বিসর্জন করো।

গুপী : নইলে আমাদের কান্নায় এই অন্ধ কারাগার প্লাবিত হবে।
আমরা শুধু হুকুম তামিল করতে শিখেছি, পরমেশ্বর
নিজেদের চিন্তা কোনোদিন কাজে লাগাইনি।
পরমেশ্বর?

পরমেশ্বর : কি বলছো ?

গুপী : তুমি কিছু বলো পরমেশ্বর
আমাদের তুমি মুখর হতে বলেছিলে
এখন তোমার নীরবতা আমাদের হৃদয় দংশন করছে।

লাবণ্যময়ী : শান্ত হও গুপী, স্থির হও তুমি অনন্তরাম
একই ভবিতব্য দিয়ে বাঁধা এই সমাবেশ।
প্রহরী জল্লাদ ডেকে গেলো অন্ধ নিয়তির মতো
কিন্তু আমরা মানি না নিয়তির নির্মম বিলাপ।

সকলে : মানি না, মানি না, মানি না।
লাবণ্যময়ী : আমরা কর্মেশ্বরের মুখোমুখি হতে চাই।
পরমেশ্বর : কোথায় কর্মেশ্বর ?
ভীরু কাপুরুষ দণ্ড দিয়ে চালায় শাসন
একপাল ক্রীতদাস, শোষক-ঘাতক সব
সে কোথায় ? তাকে খুঁজে বের করতে হবে
সেই আত্মগোপনকারী নির্মম শোষককে

[ দূর থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসে। সবাই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। সুর নিকটতর হয়। বোঝা যায় কারা যেন সমস্বরে কতকগুলি কথা বলছে সুর করে ]

আমরা সবাই বুঝি এবার হবো পলাতক
প্রভু তুমি, আমি এবং ঘাতক
যা হোক তা হোক
আমরা এবার হবোই পলাতক :
আমাদের ছিলো না কানাকড়ি
এখন মিলছে গলায় দড়ি
প্রভু দিলেন সুড়সুড়ি
জীবনটাকে উড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাতে দিই তুড়ি
আমাদের ছিলো না কানাকড়ি।
আমরা সবাই বুঝি এবার হবো পলাতক···
আহা গো, আহা, আহা, আহা !
যা বলি শোনো তাহা
চুপ করে থেকো না আর
তাহলে থাকবে নাকো ঘাড়
এ কথা সত্যি সত্যি সত্যি বলছি যাহা
আহা গো, আহা, আহা, আহা !
চৈত্র মাসে এসেছিলো সে কি ভীষণ ঝড়
ভেঙেছিলো এই গরাদঘর।
প্রভু হলেন খাপ্পা রেগে
সবাই ঘুম থেকে উঠলো জেগে

বললো আজকে যা হোক তা হোক
আমরা সবাই মিলে হবো পলাতক :

[ সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সুর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় ]

গুপী : ওরা কারা ?

সকলে : ওরা কারা ? ওরা কারা ? ওরা কারা ?

অনন্তরাম : ওরা কারা পরমেশ্বর
আমাদের হৃদয়ে বিদ্যুৎ খেলিয়ে গেলো ?

গুপী : ওরা কারা লাবণ্যময়ী
ভবিতব্যের মতো কথা বলে গেলো ?

লাবণ্যময়ী : ওরাও এখানকারই বন্দী মানুষ।

সকলে : বন্দী ? আমাদেরই মতো বন্দী ?

লাবণ্যময়ী : বন্দী, তবে নির্ভয়।

পরমেশ্বর : ওরা বন্দী, কিন্তু ওদের বিবেক মরেনি লাবণ্যময়ী
ওরা গাইছে শিকল ভাঙার গান
বুঝতে পারছো না ওদের কথা ?
গেরিলা যোদ্ধার মতো ঠারেঠুরে চেয়েছে বোঝাতে :
'আমরা প্রস্তুত সহবন্দীর দল, তোমরা ঠিক থেকো।'

লাবণ্যময়ী : বাইরের দিকে তাকালে চোখে পড়ে আগুন-রাঙা আকাশ
দূর থেকে ভেসে আসে জীবন্ত মানুষের গলার ডাক
মানুষের আগুনে-কণ্ঠস্বর।
তোমরা বুঝতে পারছো না, এ সবই মুক্তির সংকেত,
ভাঙো ভাঙো এ শিকল,
বুঝতে পারছো না তোমরা গুপী, অনন্তরাম ?

গুপী : আমরা যেন আজ বধির হয়ে গেছি
শত বজ্রের আওয়াজ না হলে কিছু শুনি না।

অনন্তরাম : আমরা শেষবারের মতো মুক্তির কথা শুনবো
মুক্তি ! সে কি আকাশের পাখির ডানার মতো ?
মুক্তি ! সে কি নারীর ভালোবাসার মতো ?

[ দূরে মিছিলের শব্দ। নানাবিধ শ্লোগান 'শোষণ চলবে না' সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক 'ভিয়েতনাম লাল সেলাম' ইত্যাদি। শব্দ ভেসে আসতে থাকবে। আস্তে আস্তে তা মিলিয়ে যায় ]

গুপী : ওইখানে আমাদের মুক্তি, অনন্তরাম
ওই মিছিলের তালে তালে আমাদেরই পদধ্বনি
আমি ওদের কণ্ঠস্বর চিনি
মানিক, বাবুলাল, নয়ন, ওরা সব
একদিন আমিও ওদের দলে ছিলাম
জানি না কেমন করে চলে এসেছিলাম এইখানে
কর্মেশ্বরের গোলামখানায় ?

অনন্তরাম : আমি যেন নিজের নাম মনে করতে পারছি না।
গুপী, তুমিই আমাকে এনেছিলে এখানে।
এই মায়াবী পুরীতে যেদিন এসেছিলাম
তখন আকাশে ছিলো আজকের মতোই এক পাণ্ডুর চাঁদ
মনে হয়েছিলো এই তো আকাশ, এই তো চাঁদ
আমাদের চিরকালের চেনা।
মনে হয়েছিলো, কেউ কেড়ে নিতে পারবে না এই চিরচেনাদের।

গুপী : [ নিস্তেজ হেসে ] তারপর ?…থামলে কেন অনন্তরাম ?
কাঁচা পয়সার লোভে যেদিন এসেছিলে
তখন তো পিছন ফিরে তাকাওনি ?
তখন গুপীর কত খাতির !
মনে আছে ? বলেছিলে, 'গুপী, আমাকেও নিয়ে চলো
কর্মেশ্বরের যন্ত্রশালায়,
সেখানে গেলে খেতে পাবো।'

অনন্তরাম : মনে আছে, সবই মনে আছে।
আমাদের ঘরে অন্ন ছিলো না গুপী
ঘরণীকে দিতে পারতুম না দুমুঠো ভাত
শিশুদের কান্নায় আকাশ জমাট হয়ে উঠতো
আমরা বড় দুঃখী ছিলাম।

গুপী : আর এখন ? সুখের ঢেউ ভাঙছে দেহে মনে ?
তাই না ?

লাবণ্যময়ী : তোমরা চুপ করো গুপী, অনন্তরাম
এ-তর্কের কোনো শেষ নেই জানি।

তোমাদের কোনো দোষ নেই। এই প্রলোভন সর্বত্র···
ক্ষুধার্ত ইঁদুর যেমন খাদ্যের অন্বেষণে গিয়ে
বন্দী হয় যাঁতাকলে, তোমরা এবং আমরা
সেই অমোঘ ভবিতব্যের হাতে বন্দী।

সকলে : অমোঘ ভবিতব্য ?

লাবণ্যময়ী : [ আবিষ্টের মতো ] তা নয়তো কি ? দুর্বার তার আকর্ষণ
মৃত্যুর দিকে, বিস্মরণের দিকে, নামহীনতার শীতল গলিতে
কি নিদারুণ আত্মসমর্পণ !

পরমেশ্বর : লাবণ্যময়ী

লাবণ্যময়ী : কিছু বলবে পরমেশ্বর ?

পরমেশ্বর : আশ্চর্য গভীর কথা বলো তুমি,
তোমাকে নতুন করে দেখছি এই দুঃসময়ে,
গভীর বিপদের মাঝখানে,
তুমি সুন্দর লাবণ্যময়ী !

লাবণ্যময়ী : তুমি মোহমদির দৃষ্টিতে তাকিও না পরমেশ্বর
ক্যাকটাসে কখনও ফুল ফোটে ?
সে যে আকস্মিক আলোর ঝলকানি
জানতুম আমরাই বুঝি জন্ম রোমাণ্টিক
তুমি তো চিরকাল তাকে ব্যঙ্গ করেছো
বলতে, ও চাঁদ তোমাদের জন্য তোলা থাক লাবণ্যময়ী
কুকুর-কাঁদানো জ্যোৎস্নায় আমি বিচলিত হই না।

পরমেশ্বর : লাবণ্যময়ী :

লাবণ্যময়ী : ভুল বললাম পরমেশ্বর ?

পরমেশ্বর : নিজেকে আমি বহুবার দীর্ণ করেছি
আত্মবিশ্লেষণের চাপে
এ যেন দর্পণে মুখ দেখা।
তবু বলি, ব্যঙ্গ করতুম নিজেকেই, তোমাকে নয়।

লাবণ্যময়ী : ও কথা এখন থাক
আমরা কর্মেশ্বরের মুখোমুখি হবো আজ।

পরমেশ্বর : কর্মেশ্বরের জাল পাতা আছে সর্বত্র

কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে,
লাবণ্যময়ী তুমি তো স্বাধীন ছিলে
তুমি এলে কেন এখানে ?

লাবণ্যময়ী : আমরা কেউ আর স্বাধীন নই পরমেশ্বর
আমরা যেন সবাই পুতুল
আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মতন
একই রকম কাঁদি, একই রকম হাসি
আমাদের ভবিষ্যৎ বাঁধা দেওয়া আছে
সেই অদৃশ্য শোষক শক্তির কাছে
তাই না ?

সকলে : তাহলে আমরা কি করে বাঁচবো ?
কি করে বাঁচবো ? কি করে বাঁচবো ? কি করে বাঁচবো ?

গুপী : আমাদের ছেলেপুলে আছে।

অনন্তরাম : আমাদের স্ত্রীগণ বহু কষ্টে দিনযাপন করছে
আমরা ফিরে গেলে ওদের মুখে জুটবে অন্ন।

লাবণ্যময়ী : হতাশ হোয়ো না গুপী,
নিরাশ হোয়ো না অনন্তরাম
আমরা আগামী দিনের আলোকের প্রত্যাশায়
আজ শহীদ হবো।

সকলে : শহীদ ! রক্ত ! মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়া !

অনন্তরাম : ময়দানে স্ট্যাচু বানিয়ে ফুলের মালা দেওয়া ?
অসম্ভব !
আমাদের শহীদের দুর্লভ ভাগ্য থেকে রক্ষা করো
আমাদের গরাদ ভাঙতে শেখাও পরমেশ্বর
তুমি জ্ঞানী, তুমি দূরদর্শী, তুমি অকুতোভয়।

[ একটা গুঞ্জন ওঠে। সকলের চোখে মুখেই জিজ্ঞাসা ]

পরমেশ্বর : [ প্রচণ্ড অট্টহাসি হেসে ] হা হা হা হা···হা হা হা হা
কি বললে অনন্তরাম ?
আমি জ্ঞানী, আমি দূরদর্শী, আমি অকুতোভয় !
আরও কি কি বিশেষণ আছে সব বলো,

বলো হে, চুপ করে আছো কেন তোমরা ?

গুপী : আমাদের মার্জনা করো পরমেশ্বর
আমরা মুক্তি চাই।

[ শেকলের আওয়াজ ওঠে একসঙ্গে। দরজায় আঘাতের শব্দ ]

অনন্তরাম : ওই, ওই, ওই
শুনতে পাচ্ছো পরমেশ্বর ?
মানুষ মুক্তি চায়, তারা শহীদ হতে চায় না।

[ আবার নিস্তব্ধতা। আলো স্তিমিত হয়ে আসে। প্রবেশ করে জল্লাদ ]

জল্লাদ : [ অট্টহাসি হেসে ] হা হা হা হা
তোমরা মিছে জটলা করছো
চিরকালের বন্দীত্ব তোমাদের।
তোমরা বরং বিলাপ করো নিজেদের কৃত কর্মের জন্য
শোক করো নিজেদের অন্ধকার ভবিষ্যতের জন্য।

অনন্তরাম : তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছো ?

গুপী : আমরা আর কিছুতেই ভয় পাই না জল্লাদ
দেখছো না, আকাশে ছাতার মতো বিরাট চাঁদ
দেখছো, বাইরে মানুষের বিশাল মিছিল

জল্লাদ : হা হা হা হা
কবি ? তোমরা কবি নাকি হে ?
ওসব তোমাদের জন্য নয়
তোমরা কর্মেশ্বরের বন্দীশালায় চিরকালের অতিথি
হা হা হা হা

লাবণ্যময়ী : তোমার জানা শেষ জানা নয় জল্লাদ
আমরা আগামী কালের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

জল্লাদ : [ ব্যঙ্গের সুরে ] শুনতে পেলে কিছু বলো।

[ হঠাৎ আলো স্তিমিত হয়ে আসে। হিংস্র জন্তুকে যেভাবে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে সেইভাবে বন্দীরা শিকলশুদ্ধ হাত নিয়ে ঘিরে ফেলে জল্লাদকে। জল্লাদ কিছু বলবার আগেই মানুষেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গানের সুর বাজতে থাকে। আমরা হবো পলাতক। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। ]

লাবণ্যময়ী : চলো।

[ ওরা এগোতে যাবে এমন সময় গুপী অনন্তরাম ইত্যাদিদের আবার প্রবেশ ]

গুপী : আমাদের উদ্ধার করো পরমেশ্বর

অনন্তরাম : আমরা পথ খুঁজে পাচ্ছি না লাবণ্যময়ী
জল্লাদকে হত্যা করে বন্দীশালার দরজা ভেঙেছি
কিন্তু এর পাঁচিল নিশ্ছিদ্র
বাইরে বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

[ বাইরে মিছিলের আওয়াজ। নানারকম স্লোগান শোনা যাচ্ছে 'অত্যাচারী নিপাত যাক' 'শোষণরাজ চলবে না' ইত্যাদি। মনে হয় উত্তাল সমুদ্র বাইরে এসে তটে আছাড় খাচ্ছে ]

পরমেশ্বর : আমিও যে তোমাদের মতো বাধা পড়ে আছি
এই বন্দীশালায়।

লাবণ্যময়ী : তুমি বিহ্বল হয়ে পড়েছো পরমেশ্বর
এই মুহূর্তে ও কথা তোমার মুখে মানায় না।

[ বাইরে শব্দ প্রচণ্ডতর হতে থাকে। যেন ঝড় বইছে। থেকে থেকে গুপী অনন্তরাম আর্তনাদ করে বলছে 'আমরা শিকল ভেঙেছি, কিন্তু পাঁচিল ডিঙোতে পারছি না।' ]

পরমেশ্বর : গুপী, অনন্তরাম, এবং অন্যান্য যারা আছো
আজ তোমাদের মহত্তর স্বীকৃতির দিন
তোমরা বন্দীশালার দরজা ভেঙেছে
এর চেয়ে বীরত্বের কাজ আর কি হতে পারে ?

সকলে : আমাদের ভরসা দিচ্ছো তুমি মিথ্যা স্তোকবাক্যে
কখনো তোমার মুখে তীব্র ভৎর্সনা,
কখনো নির্জলা স্তোক
কোনটা বিশ্বাস্য পরমেশ্বর ?

পরমেশ্বর : আমি তোমাদের ভোলাতে চাইনি,
এ আমার আত্মসমালোচনা,
আমি পারছি না, আমি জানি না এর পর কি ?

লাবণ্যময়ী : না, ও কথা নয়
আমাদের জানতেই হবে

প্রথম প্রতিবন্ধক তোমরা সকলে সরিয়েছো,
বাকিটুকু তোমরাই পারবে।
পরমেশ্বর, তুমি বিহ্বল হোয়ো না,
তোমার কাজ বাকি আছে।

পরমেশ্বর : লাবণ্যময়ী,
আমি এদের নিয়ে কোন পথে যাবো ?
তুমিই বলে দাও

লাবণ্যময়ী : চলো আমরা সকলেই এগোই
আমাদের খুঁজে বের করতে হবে
এই পাঁচিলের দুর্বলতম জায়গা
সেখানেই আঘাত করে দিতে হবে ভেঙে

সকলে : ঠিক ঠিক, লাবণ্যময়ী ঠিক কথা বলেছে।

পরমেশ্বর : চলো, চলো, চলো, আমরা সবাই এগোই চলো।

[ সবাই যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ক্যামেরা কাঁধে এক সাংবাদিকের প্রবেশ ]

সকলে : কে গো তুমি ? কে বটে হে ?

[ সাংবাদিকটি কারো কথা না শুনে একটি ভালো জায়গা বেছে নিয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত ]

সকলে : কি ব্যাপার ? ছবি তোলে কেন ?
কে গো তুমি ? এখানে এই বন্দীশালায়
ঢুকলে কি করে ?

সাংবাদিক : আমি একজন রিপোর্টার
এসেছি তোমাদের খবর সংগ্রহ করতে, ছবি তুলতে।
আজ বৃহত্তম সংবাদের দিন
সংবাদ তৈরি হয়েছে কর্মেশ্বরের বিশাল যন্ত্রশালায়।

সকলে : সংবাদ ? কিসের সংবাদ ?

লাবণ্যময়ী : তুমি কি কর্মেশ্বরের প্রেরিত লোক !

সাংবাদিক : তা হতে যাবো কোন দুঃখে ?
আর কর্মেশ্বরই বা কোথায় ?
ও নামে কেউ নেই, কেউ ছিলো না। কেউ থাকবে না।

ওফ্ কি সাংঘাতিক স্কুপ ! সেন্সেসনাল খবর
বন্দীরা জেল ভেঙেছে, বাইরের জনতা ভেঙেছে
পাঁচ মানুষ সমান অন্ধকারের পাঁচিল
দি গ্রেট রেবেলিয়ান
এমন ঘটনা আর ঘটেনি।
['সকলে হৈ হৈ করে ওঠে। নানারকম কথা-বার্তার টুকরো ভেসে আসে ]

পরমেশ্বর : কি বলছো হে ? সত্যি ?

সাংবাদিক : দেখুন আমরা সাংবাদিক,
বানিয়ে অনেক সময় লিখতে হয় বটে
কিন্তু অবজেকটিভ্ হওয়াই আমার লক্ষ্য।
আমি যা বলছি সব সত্যি, একটুও বানানো নয়।
সারা শহরের মানুষ, নর-নারী ছেলে-বুড়ো
লক্ষ লোক জমায়েত হয়েছে রাজপথে।

[ বাইরে জনতার আওয়াজ ]

ওই শুনছেন না তার দৃপ্ত কণ্ঠের ধ্বনি।
ওফ্, আমার ইচ্ছে করছে···ইচ্ছে করছে

সকলে : কি ইচ্ছে করছে বাপু, বলোই না।

সাংবাদিক : ইচ্ছে করছে কলম ফেলে দিয়ে
ওদের দলে ভিড়ে যাই
বলি, আমরাও আছি তোমাদের পক্ষে।

[ জনতার হর্ষধ্বনি ]

পরমেশ্বর : কর্মেশ্বর বাধা দিলো না ?

সাংবাদিক : কর্মেশ্বর বলে কেউ নেই।
কতগুলি ভীরু, কাপুরুষ শোষকের দল
ওই নামে এক অদৃশ্য শক্তি দাঁড় করিয়ে
চরম অত্যাচার চালিয়েছিলো এই যন্ত্রশালায়
আজ মানুষের দুর্বার প্রতিরোধের আঘাতে
ভেঙে গেছে এই অন্ধকারের দুর্গ।

[ সকলের হর্ষধ্বনি

মানুষ আজ স্বাধীন, মুক্ত, আত্মপ্রত্যয়ী

[ সকলের আবার হর্ষধ্বনি। সাংবাদিক হাত ঘড়ি দেখে ]

ওফ্‌ আটটা বেজে গেছে,

এয়ার মেল এডিশনে খবরটা ধরাতেই হবে।

[ লাবণ্যময়ী ও পরমেশ্বরের একটা ছবি তুলে নিয়ে চলে যায় ]

**সকলে :** আমরা স্বাধীন, আমরা মুক্ত পরমেশ্বর

আমরা মুক্তি পেয়েছি লাবণ্যময়ী।

**লাবণ্যময়ী :** হ্যাঁ অনন্তরাম গুপী।

তোমরাই এই বন্দীশালার দরজা ভেঙেছো।

**গুপী :** পরমেশ্বর আমাদের জাগিয়েছিলো।

**অনন্তরাম :** লাবণ্যময়ী দিয়েছিলো আমাদের সাহস।

**পরমেশ্বর :** তোমরা সকলে নিজেরাই জেগেছিলে

নিজেরাই অর্জন করেছিলে সাহস।

[ জনতা আনন্দে হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে যায়। শূন্য মঞ্চ। শুধু লাবণ্যময়ী আর পরমেশ্বর। আকাশে চাঁদ ]

**পরমেশ্বর :** লাবণ্যময়ী!

**লাবণ্যময়ী :** কিছু বলবে পরমেশ্বর।

**পরমেশ্বর :** তোমাকে আজ আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে লাবণ্যময়ী

মনে হচ্ছে তুমি এক অসামান্যা নারী

তোমার চোখে মানুষের প্রত্যয়ের স্বপ্ন

তোমার দেহে চিরকালের আশার অভিব্যঞ্জনা।

**লাবণ্যময়ী :** [ আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে ]

পরমেশ্বর আজ তোমাকে ফেরাবো না।

আমার চির-বঞ্চিত জীবনে তুমিই ফোটালে

ভালোবাসার অম্লান কুসুম

[ পরমেশ্বর এগিয়ে এসে লাবণ্যময়ীকে আলিঙ্গন করে। আনন্দে লাবণ্যময়ীব চোখে আসে জল ]

আজ বধ্যভূমিতে আমাদের বাস⁻ পরমেশ্বর।

**পরমেশ্বর :** হ্যাঁ লাবণ্যময়ী,

আজ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে আমাদের চিরকালের মিলন

চলো আমরা মানুষের সমুদ্রের কাছে যাই।

[ ওরা ধীরে ধীরে এগোয়। বাইরে জনতার ধ্বনি। পর্দা নামে। ]

## মোহিত চট্টোপাধ্যায়

# রিঙ

---

[ ঘরটা এলোমেলো। কিছু আধুনিক ছবির ক্যানভাস ইতস্তত—দেয়ালে, মেঝের ছড়ানো-ছিটোনো। একটা টেবিল ছবি আঁকার সরঞ্জামে প্রায় উপ্‌ছে রয়েছে, টিনের চেয়ার দু-তিনটে—এধারে ওধারে রঙ লেগে আছে। একটা বেশ বড় মাটির ঘোড়া ভাঙা ডা'ন-পাটা শূন্যে তুলে আছে। অরুণ সিগারেটে বেপরোয়া টান দিচ্ছে, মুখে অস্থিরতা, দৃষ্টি অনির্দিষ্ট। ওর চেহারায় বিপর্যস্ত তারুণ্য। অরুণের অন্যমনস্কতার মধ্যে ওর স্ত্রী শীলা এসে এক কোণে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে রাত একটার ঘণ্টা বাজে। অরুণ কিছুটা চমকে ঘাড় ফেরাতে শীলাকে দেখে। শীলা ছিম-ছাম মার্জিত চেহারার মেয়ে—মুখটা বিষণ্ণ। ]

অরুণ : একি এখনো ঘুমোওনি ?

শীলা : ডাক্তারবাবু কি এত রাত্রে আর আসবেন ? মিছেমিছি জাগছো, শুয়ে পড়ো।

অরুণ : না-না ঠিক আসবে। ওর সঙ্গে আলোচনা ভয়ানক জরুরি। তুমি শুয়ে পড়ো।

শীলা : ঘুম পাচ্ছে না।

অরুণ : [ পকেট থেকে ট্যাবলেট বের কোরে ] এই নাও, এই ঘুমের ট্যাবলেটটা খেয়ে নাও।

শীলা : ও ট্যাবলেটে কিছু হয় না।

অরুণ : বেশ, দুটো খাও।

শীলা : আজকে আমাকে ঘুমোবার জন্যে এত জোর করছো কেন বলতো ? কিছু একটা তোমার মাথায় ঘুরছে। আজ সারাটা দিন তোমাকে অস্থির দেখাচ্ছে।

অরুণ : আমাকে কোনো রকম সন্দেহ করছো মনে হচ্ছে ?

শীলা : তুমি আমাকে সন্দেহ করো না ?

অরুণ : আমার উপায় ছিলো না। তুমি যদি রিঙদুটো ফিরিয়ে দিতে কোনো রকম ঝঞ্ঝাটই হোতো না।

শীলা : আমি তোমার রিঙ নিইনি।

অরুণ : [ একটা রঙ আঁচড়ে-আঁচড়ে তোলা খোলানো ক্যানভাস দেখিয়ে ] ক্যানভাসটার দিকে তাকাও, তোমার মায়া হবে। আমাদের অমন প্রিয় ছবিটা থেকে তুমি যে কি করে রিঙদুটো আঁচড়ে আঁচড়ে তুলে নিতে পারলে ! ছবিরও গায়ে আঘাত লাগলে রক্ত পড়ে—আমি তোমার নখে ঐ রক্ত দেখেছিলাম। সন্দেহ আমার অমূলক নয় শীলা!

শীলা : আমার নখে কি করে রঙ লেগেছিলো, আমি জানি না। তোমার টেবিল গোছাতে গিয়ে প্যালেট থেকেও লাগতে পারে।

অরুণ : [ ক্ষুব্ধ ভাবে ] আমাকে বোঝাতে চেষ্টা কোরো না, আমি রঙ চিনি ! ওটা আমার ক্যানভাসের রঙ। শুকনো রক্তের মতো তোমার নখে লেগেছিলো। তোমার দুটো হাত আদর করে ধরতে গিয়ে আমি যেন সাপের ছোবল খেলাম। এ-সব তুমি হিংসেয় করছো।

শীলা : হিংসে ?

অরুণ : হ্যাঁ, হিংসে ! তুমি দিনের পর দিন আয়তনে ছোট হয়ে যাচ্ছো—আর তার থেকে তোমার মধ্যে স্পষ্ট একটা কপ্লেক্স গড়ে উঠছে টের পাচ্ছি। তোমার ধারণা তুমি ছোট হয়ে যাচ্ছো বলে আমি তোমাকে মনে মনে বিতৃষ্ণায় ত্যাগ করছি। কিন্তু আমি তোমাকে এখনো আপন ভাবি।

শীলা : মিথ্যে কথা। রোজ এসে তুমি আমাকে মাপো। যেই ছাখো, আর একটু ছোট হয়ে গেছি অমনি তোমার মুখটা কেমন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে

অরুণ : নিষ্ঠুর নয়, করুণ হয়ে ওঠে।

শীলা : নিষ্ঠুর মুখ কাকে বলে আমি চিনি। তাছাড়া তোমার আচরণ, সেটাও কি দিনের পর দিন বদলাচ্ছে না ?

অরুণ : তুমি ভুল ভাবছো।

শীলা : ভুল আমি ভাবি না।

[ বাইরে কড়া নড়ে ওঠে। অনেকগুলো গলা শোনা যায়। অরুণ চঞ্চল ভাবে উঠে পড়ে। দরজা খুলতে যায়।

অরুণ : বললুম, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো !

শীলা : দাঁড়াও, দরজা খুলো না। আগে বলো এত রাত্রে কারা এলো ? তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে এদের জন্যেই তুমি অপেক্ষা করছো!

ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই নন—অনেকগুলো অন্য রকম গলা পেলাম।

অরুণ : তুমি ভেতরে যাও।

শীলা : আমাকে ও-ঘরে পাঠালেই সব কথাবার্তা আড়াল হয়ে যাবে ভাবছো ' আমি শুনতে পাবো না ?

অরুণ : কি আশ্চর্য, ওদের কি বাইরে এত রাত্রে দাঁড় করিয়ে রাখবো ?

শীলা : ওরা কারা ?

অরুণ : পুলিশের লোক।

শীলা : পুলিশের লোক কেন ?

অরুণ : আমি ডেকেছি।

শীলা : কেন ?

অরুণ : ওরা বাড়িটা সার্চ করবে। রিঙটুটো আমার চাই।

শীলা : তার মানে, তুমি নিশ্চিত হয়ে আছো, আমি তোমার ক্যানভ্যাস থেকে রিঙটুটো চুরি করে কোথাও লুকিয়ে রেখেছি।

অরুণ : বলেছি তো, আমার যা ধারণা হয়েছে, তোমাকে তা লুকিয়ে অসৎ হতে চাইনি। তোমাকে বারবার ফিরিয়ে দিতে বলেছি, তুমি কানেই তোলোনি, অগত্যা আমার উপায় ছিলো না।

শীলা : আমি নিইনি।

অরুণ : ওঁরা খোঁজার পরেই প্রমাণ হবে। যদি না পাওয়া যায় আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিও মিটে যাবে।

[ বাইরে তীব্র কড়া নড়তে থাকে ]

অরুণ : খুলে দিচ্ছি।

শীলা : যা খুশি। কিন্তু তুমি আমাকে অপমান করলে।

অরুণ : অপমান করতে আমি চাইনি। খুলে দিচ্ছি।

[ দরজা খুলে দেয়। একজন অফিসার কয়েকজন পুলিশ সহ ঢোকে ]

অফিসার : নমস্কার

অরুণ : নমস্কার।

অফিসার : এখনো রিঙটুটো পাননি ?

অরুণ : না।

অফিসার : তাহলে সার্চ করতেই হবে ?

অরুণ : সেজন্যই আমি আপনাদের ডেকেছি।

অফিসার : [ পুলিশদের ] তোমরা ভেতরের ঘরগুলো খুঁজতে থাকো। কেউ ওদের হেল্প করবে নিশ্চয়ই, মানে বাক্সের চাবিগুলো চাই, সার্চের সময় অবশ্য কাছে থাকা যাবে।

শীলা : আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

[ অরুণ শীলার দিকে তাকায়। শীলা গম্ভীর। পুলিশদের সঙ্গে নিয়ে শীলা ভিতর ঘরে চলে যায়। অফিসার ওকে লক্ষ্য করে ]

অফিসার : আপনার স্ত্রী ? উনি কতদিন ধরে ছোট হচ্ছেন ?

অরুণ : সাত আট বছর।

অফিসার : কত ইঞ্চি ক'রে ছোট হন ?

অরুণ : ইঞ্চি মেপে হন না, আমি টের পাই। ও অনেক ছোট হয়ে গেছে।

অফিসার : তাহলে উনি অনেক লম্বা ছিলেন বলেন ?

অরুণ : না, খুব একটা নয়।

অফিসার : ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ গোলমেলে লাগছে। আচ্ছা, আপনার সেই ছবির ক্যানভাসটা কোথায়, যেখান থেকে রিঙ-দুটো চুরি গেছে ?

অরুণ : [ ক্যানভাসটা দেখিয়ে ] ঐ দেখুন, কি রকম আঁচড়ে আঁচড়ে তুলে নিয়েছে।

অফিসার : ছবিটায় কি কেবল রিঙই ছিলো ?

অরুণ : ছবিটাকে আমাদের একটা যৌথ পোর্ট্রেটও বলতে পারেন। সাবজেক্টটা ছিলো, যেন আকাশ থেকে, কিংবা ধরুন তারো উঁচু থেকে

অফিসার : আকাশ থেকেও আবার উঁচু কোন বস্তুটি ?

অরুণ : ব্যাপারটা আপনাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না। আকাশের উপরে আকাশ—বুঝতে পারলেন ?

অফিসার : না।

অরুণ : তাহলে আপনি আমার স্টেটমেণ্টটা কেবল লিখে যান।

[ অফিসার ঘাড় নেড়ে নোট করতে প্রস্তুত হয় ]

অরুণ : সেই রহস্যময় উঁচু থেকে দুটো দড়ি ঝুলছিলো, তার সঙ্গে আমি দুটো রিঙ আঁকলুম।

অফিসার : [ ভূতের গল্প শোনার মতো মুখ। নোট নিতে থাকে ] তারপর ?

অরুণ : আমি ওই রিঙদুটোয় নানা রঙের পালকের দুটো পাখি দুটো রিঙে ঝুলিয়ে দিলুম।

অফিসার : পাখিজুটো দেখছি না তো।

অরুণ : রিঙ নেই তো। কয়েকদিন ওরা হাওয়ায় ঝুলে থাকলো। ওদের খাঁচাই বলুন, আর আশ্রয়ই বলুন কিংবা আনন্দ—সেতো ঐ রিঙ দুটো। রিঙ চুরির পর ওরা দু-একদিন অসহায় ঝুলতে ঝুলতে আর্তনাদ করে চেঁচামেচি করলো। তারপর একদিন কোথায় উড়ে গেলো।

অফিসার : পাখিজুটোর যে রকম শোচনীয় অবস্থা হয়েছিলো, তাতে ওরা হয়তো বেশিদূর উড়েও যেতে পারেনি ; কাছাকাছি কোথাও ডানা ভেঙে পড়ে আছে। কাছাকাছি চারদিক খুঁজে দেখেছেন ?

অরুণ : মন্দ বলেননি খুঁজতে হবে।

অফিসার : আর একটা সন্দেহও আমাব মাথায় উঁকি দিচ্ছে—এও তো হতে পারে শীলা দেবী ঐ পাখিজুটোও লুকিয়ে রেখেছেন।

অরুণ : এটা কিন্তু ভাবিনি।

অফিসার : ভাবতে হবে। ভাবার জন্যে মাথা দরকার। আমাদের এটাই কাজ কিনা। আমাদের মধ্যে যে যত সন্দেহ করতে পারে, তার তত উন্নতি। আপনাকে আর একটা অনুমানের কথাও বলতে পারি। অর্থাৎ পাখিজুটো আর বেঁচে নেই।

অরুণ : বেঁচে নেই ?

অফিসার : থাকবে কি করে ? ওদের লুকিয়ে রাখতে হলে, মেরে মাটির নিচে রাখাই স্বাভাবিক।

অরুণ : আমি কিন্তু এতটা ভয়ংকর কিছু ভাবতে পারিনি।

অফিসার : ভাবতে গেলে মাথা চাই, বুঝলেন ? আমাদের এটাই কাজ তো! আমাদের মধ্যে যে যত অশুভ অনুমান করতে পারবে, সে তত বড় হবে। দেখবেন, আমি কত বড় হই।

[ বাইরে আবার কড়া নড়ে। অরুণ ব্যস্তভাবে উঠে পড়ে ]

অফিসার : কে ? এত রাত্রে ?

অরুণ : ডাক্তারবাবু। উনি নিজের ইচ্ছেয় শীলার কেসটা টেক্ আপ করেছেন। উনি একজন হিপ্‌নোটিস্ট। দাঁড়ান খুলে দিচ্ছি।

অফিসার : একটু কাল অপেক্ষা করুন। আমি বন্দুকটা বের করেনি। যে-ই আসুক আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার। না জানিয়ে যদি আমার মা আসেন তাহলেও আমার রিভলবার লোডেড্ রাখবো।

আমাদের মধ্যে যে যত বেশি সতর্ক হবে সে তত বড় হবে।
[ বন্দুকটা হাতে রাখে ] এবার খুলে দিন।

[ অরুণ দরজা খুলে কাউকে দেখতে না পাবার মতো মুখ করে। দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে ]

অরুণ : কাউকে তো দেখলাম না। অথচ কড়াটা বেশ জোড়ে নড়লো না?

অফিসার : বেশ জোরে। সম্ভবত আমার বন্দুকের কথা শুনে পালিয়েছে। একটু সাবধানে থাকবেন।

অরুণ : এ-ও হতে পারে, সেই পাখিদুটো ঘরে ঢুকতে চাইছিলো। ঠোঁট দিয়ে কড়াটা নেড়ে আমাকে ডাকছিলো।

অফিসার : তার মানে পাখির ভূত! এ ব্যাপারে কিন্তু আমি আপনাকে হেল্প করতে পারবো না, কারণ আমার বন্দুকে আজ অবধি কোনো ভূত মারা পড়েনি। অবস্থাটা কিন্তু ঘোরালো হয়ে উঠছে। আমাদের দায়িত্বটা দ্রুত শেষ করে ফেলা উচিত। ওদের ভিতরে গিয়ে একটু তাড়া দিন না।

অরুণ : আমি দরজাটা তাহলে খুলেই রাখি, কি বলেন? পাখিদুটোর আত্মা যদি আসতে চায়, আসুক। ওরা আমাকে চায়।

অফিসার : কিন্তু আমাকে চায় না, বুঝলেন তো। আমার কাঁধদুটো বেশ চওড়া দেখছেন তো। দাঁড় ভেবে যদি প্রেতাত্মাদুটি বসে পড়ে, সে কি রকম সাংঘাতিক ব্যাপার হবে ভাবুন। অহেতুক জড়িয়ে কি লাভ বলুন। আমাদের মধ্যে যে যত অনাবশ্যক না-জড়াতে চায়, সে তত বড় হয়। বড় হতে গেলে, আমার উঠে পড়াই উচিত, তাই না? [ চেঁচিয়ে ডাকে ] রাম সিং!

[ পুলিশের দলটা ফিরে আসে ]

অফিসার : পেলে?

রামসিং : কুছ্ মিলা নেই, সাব্।

অফিসার : তাহলে আর কি, উঠে পড়ি। তোমরা বেরোও আমি আসছি। শোনো বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলে চেঁচিও, তাহলে আর আমি বেরুবো না, মানে কাল ভোরে যাবো। কেবল ডিউটিই বড় কথা নয়—এদের প্রোটেকশন দেওয়াও তো আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, কি বলেন?

[ পুলিশের দল বেরিয়ে যায় ]

অফিসার : রাম সিং।

রাম সিং : [ বাইরে থেকে ] হুজুর !

অফিসার : বাহার মে চাঁদনিকা আলো হ্যায় ?

রাম সিং : হাঁ হুজুর।

অফিসার : আচ্ছা, তাহলে উঠি, বাইরে আলো আছে। বুঝলেন, আলো ছাড়া চলবেন না। চাঁদের আলোতে তো সবটা দেখা যায় না, বাকিটা টর্চে দেখে দেখে নেবো। তবে সাবোর্ডিনেটের সামনে আমি টর্চ জ্বালতে চাই না। কিন্তু আজকে জ্বালবো। উঠি।

[ কড়া নড়ে উঠলো। অফিসার উঠতে গিয়ে চমকে আবার বসে পড়ে ]

অফিসার : বসলুম, মানে, আপনাকে আর একটু সাবধান করা প্রয়োজন। আচ্ছা, আপনার কাছে একটা লোহার চাবি হবে ?

অরুণ : কেন বলুন তো।

অফিসার : লোহা সঙ্গে থাকলে যে কোনো রকম প্রেতাত্মা কাছেই ঘেঁষতে পারে না, বন্দুকটাই তো সব নয়। আমাদের পুলিশি আইনে, বন্দুকটা যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই বাহাদুরী।

[ অরুণ একটা চাবি দেয় ]

অফিসার : উঠি।

অরুণ : আসুন।

[ প্রৌঢ় ডাক্তার ঢোকে। কেমন কৌতুককর চেহারা ]

অরুণ : আরে ডাক্তাবাবু ! আপনিই কি আগে কড়া নেড়েছিলেন ?

ডাক্তার : হ্যাঁ, কড়াটা নেড়েই হঠাৎ দৌড়ে পাশের বাগানে গেলুম !

অরুণ : বাগানে ?

ডাক্তার : হ্যাঁ, একটা ব্যাপার চেঞ্জ্ করলুম।

অরুণ : কি চেঞ্জ্ করছিলেন ?

ডাক্তার : [ অফিসারের দিকে তাকিয়ে ] বলছি।

অফিসার : ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তাহলে আপনিই কড়াটা নেড়েছিলেন ? হ্যাঁ, অরুণবাবু, আপনার চাবিটা নিন। বন্দুক ছাড়া যে কোনো কিছুই আমার কাছে ভারি লাগে। রাখুন। [ চাবিটা দিলো ] নমস্কার। এখন বেশ হাল্কা লাগছে। চলি।

[ চলে যায়। ডাক্তার বসে ]

ডাক্তার : সার্চ করতে এসেছিলো তো ?

অরুণ : হ্যাঁ।

ডাক্তার : পাওয়া গেলো ?

অরুণ : কিছু না।

ডাক্তার : আমার ট্রিটমেণ্ট ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। একটা হিপনটিক্ স্পেল দেবো দুজনকে, ওতেই কাজ দেবে। শীলাকে ডাকো।

অরুণ : ও আমার ওপর চটে আছে। যদি দয়া করে আপনি ডাকেন।

ডাক্তার : [ চেঁচিয়ে ] শীলা, শীলা ! এদিকে একবার এসো তো মা।

[ শীলা ঢোকে। মুখটা বিরক্ত ]

ডাক্তার : সার্চ করে কিছু পায়নি তো। পাবে না জানি।

শীলা : ডাক্তারবাবু, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, আমি একটু শুয়ে পড়বো। অপমানের সীমা থাকা দরকার।

ডাক্তার : তোমার ভয় নেই, আমি রিঙদুটো আর পাখি খুঁজে বের করবো। আর যদি পাওয়া যায়—তোমার ছোট হয়ে যাবার ওষুধ পর্যন্ত তৈরি। আমাকে বিশ্বাস করো। বোসো, বোসো তুমি। [ শীলা বসে ] এই তো লক্ষ্মী মেয়ে।

অরুণ : ভেবেছিলাম, আপনি আরো আগে আসবেন।

ডাক্তার : কিছুটা আগে অবশ্য এসেছিলাম, তোমাদের বাগানের মধ্যে ছুটতে গিয়ে আবার দেরি করে ফেললাম।

শীলা : হঠাৎ বাগানে গেলেন ?

ডাক্তার : বাগানে গেলাম বলেই তো বিরাট রকম আবিষ্কারের হয়তো একটা সূত্র পেয়ে গেলাম। আমার চোখের সামনে আকাশ থেকে একটা নক্ষত্র ছিঁড়ে পড়লো, ঐ উল্কাপাত আর কি ! দেখলুম তোমাদের টগর ফুলগাছটার কাছে পড়লো, দৌড়ে ধাওয়া করে গেলুম ওখানটায়।

শীলা : উল্কাটা দেখতে পেলেন ?

ডাক্তার : নিশ্চয়।

অরুণ : তখনো পড়ে পড়ে জ্বলছিলো নিশ্চয়ই।

ডাক্তার : জ্বলবে না মানে, নিভে গেলে তারা দেখা যায় নাকি ! ঝুঁকে পড়ে দেখলুম, জ্বলছে আবার নিভছে—মানে প্রাণটা দপ্ দপ্

করছে আর কি? কি করবো ভাবছি—

অরুণ : তুলে নিয়ে এলেন না কেন?

ডাক্তার : এনেছি।

শীলা : কোথায়?

ডাক্তার : আমার কোটের পকেটে। দেখছো না, ছটো সেফ্‌টিপিন দিয়ে পকেটের মুখটা আটকে রেখেছি। এটাকে নিয়ে এখন মহা সমস্যা, ধুঁকছে—কি খেলে বাঁচবে, কি ওষুধে জোর পাবে—সে তো আর আমাদের মেডিক্যাল শাস্ত্রে নেই।

শীলা : একটু উঁকি মেরে দেখবো?

ডাক্তার : একটা সেফ্‌টিপিনের ফাঁক দিয়ে আলগোছে ছাখো।

[ শীলা উঁকি দেয় ]

অরুণ : কি করছে তারাটা?

শীলা : একেবারে-অন্ধকার। [পর মুহূর্তে] জ্বলছে. কি মিষ্টি আলো, আবার জ্বললো।

অরুণ : সরো, এবার আমি দেখবো।

[ অরুণ উঁকি দিলো ]

ডাক্তার : আমিও অনেকক্ষণ দেখিনি ওকে। কি জ্বলছে?

অরুণ: [ চেঁচিয়ে ] ঐ যে জ্বললো, কি চমৎকার আলো। আমার গোটা ক্যানভ্যাসটা জুড়ে যদি এই আলোটা আঁকতে পারতুম। আবার জ্বললো।

শীলা : যদি না বাঁচে ডাক্তারবাবু! কিছু খাওয়ান। আপনার পকেটে ছু চামচে দুধ ঢেলে দেবো, চুকচুক কোরে খাবে।

অরুণ : দাঁড়াও, চকলেট আছে, তারাটা বাচ্চা মতো আছে দেখছো না!

শীলা : খাবে কি করে? ডাক্তারবাবু ওর দাঁত আছে?

ডাক্তার : এখনো পুরোপুরি কিছু জানি না। কালকে গোটা দিন পরীক্ষা করতে হবে।

অরুণ : শীলা কালকে আমরা ছুজনে বসে বসে সব ব্যাপারটা দেখবো, আমরা থাকবো আপনার সঙ্গে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার : গ্ল্যাডলি, তোমাদের চিকিৎসা করতে এসেই তো প্রাণীটাকে পেলাম।

শীলা : যা খাওয়াতে বলবেন, আমি খাইয়ে দেব কিন্তু।

অরুণ : কোনো বেড়াল বা পাখি এসে না ঠুকরে দেয় আমি দেখবো।

শীলা : তুমি যা কাজের আমার জানা আছে!

অরুণ : কথা বোলো না তো, নিজে বেশ একা একা মজাটা পেতে চাও।

ডাক্তার : দেখেছো, তোমরা দুটিতে কেমন সহজে হাসিখুশি হতে পারো। তারাটা পেলুম বলেই বুঝতে পারলুম, চিকিৎসা করলে তোমরা সেরে যাবে। ভেতরে যখন তোমাদের ছেলে মানুষীটা একেবারে মরেনি, তখন সারবে না মানে।

অরুণ : তাহলে আপনি এতক্ষণ আমাদের চিকিৎসা করছিলেন? ওটা কি?

ডাক্তার : ওটা কি, আমি সত্যিই এখনো জানি না। চোখের সামনে আকাশ থেকে পড়েছে এটা সত্যি কথা। দেখতে এবং চরিত্রে অনেকটা জোনাকির মতো!

শীলা : ও জোনাকি? তা-ই বলুন।

অরুণ : ও রকমই দপ্ দপ্ করছিলো।

ডাক্তার : কিন্তু ওটা আকাশ থেকে পড়েছে, সন্দেহ নেই। আমার ধারণা আকাশে যত তারা দেখি ওদের মধ্যে অতিকায় কিছু জোনাকিও ঘুরে বেড়ায়। যাক্ ওটা আমার অন্য গবেষণার বিষয়। তোমরা দুজন বসে পড়ো, শরীর রিল্যাক্স করো—আমি হিপ্নোটাইজ করবো। তোমরা নিজেরাই বলবে, পাখিদুটো কোথায়, রিঙদুটো কোথায়? আমি তোমাদের দুজনকেই সন্দেহ করি।

অরুণ : আমার জিনিস আমি চুরি করবো?

ডাক্তার : এটাই বেশি হচ্ছে।

শীলা : এবার ধরা পড়বে, আসল চোর কে?

অরুণ : আমি নির্ভয়।

ডাক্তার : দুজনে ইজি চেয়ারদুটোয় শুয়ে পড়ো। আমি দু হাতের দুটো তর্জনী তোমাদের কপালের কাছে রাখছি—বাইরের জগৎ থেকে ঘুমিয়ে পড়ো, চোখ বোজো···চোখ বোজো···ভেরি গুড, অরুণ, শীলা কি ছোট হয়ে যাচ্ছে?

অরুণ : [আচ্ছন্ন কণ্ঠে] হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, আমাদের বিয়ের আগে আমার দুটো হাতের মধ্যে যেন ওর মুখখানা ধরতো না,···এখন একটা ছোট্ট নাক-চোখ-শূন্য মারবেলের মতো এতটুকু। আমি স্পষ্ট

বুঝি, ওর দুটো চোখ ছোট্ট হয়ে গিয়ে আরো কম ধরে··· হৃদয়টা সব জিনিস ধরে রাখতে পারে না, উপচে মাটিতে পড়ে যায়। পায়ের ষ্টেপগুলো কি ছোট হয়ে যাচ্ছে?

ডাক্তার : শীলা, তুমি কি ছোট হয়ে যাচ্ছো?

শীলা : ডাক্তারবাবু, কিছুদিন ধরে আমার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। আগে ও যখন আমার সঙ্গে কথা বলতো আমার মনে হোতো ছড়িয়ে যাচ্ছি···হাটলে মনে হোতো ভীষণ সুখে ছোট্ট মেয়ের মতো দৌড়তে পারি···ও মুঠো তুলে যা দিতো, বুকের মধ্যে সব ধরে যেতো, যা দেখতে বলতো চোখের মধ্যে সবটা ধরা পড়তো। এখন ওকে ছুঁলে কেমন আগের মতো লাগে না—যেন ঠাণ্ডা একটা হাত, আর ঠাণ্ডায় তো সব কিছুই গুটিয়ে কমে আসে। আমি এ সব চাইনি, ও আমাকে কেন এ রকম করলো?

ডাক্তার : অরুণ, তুমি শীলার কথা শুনেছো? কিছু বলার আছে?

অরুণ : আমি কিছু বুঝি না, কেবল উদ্ধার চাই।

ডাক্তার : তুমি কিছু বলবে শীলা?

শীলা : আমি কিছু বুঝি না, কেবল আগের মতন হতে চাই।

ডাক্তার : শীলা, তুমি রিঙদুটো নিয়েছো?

শীলা : হ্যাঁ।

ডাক্তার : নিয়ে আসতে পারবে?

শীলা : পারবো।

ডাক্তার : তুমি যাও।

[ শীলা আচ্ছন্নের মতো উঠে যায় ]

ডাক্তার : অরুণ, তোমার রিঙ আসছে, শীলা আনতে গেছে।

অরুণ : আমি জানতাম।

ডাক্তার : তুমি রিঙে তোমাদের না এঁকে পাখিদুটো আঁকলে কেন?

অরুণ : ছোট বেলায় একটা রুপোর কলিং বেলের স্বপ্ন দেখেছিলাম। ওটা বাজালে মানুষের বদলে বনের পাখিরা আসতো। পাখি এক এক সময় মানুষের থেকে কম মনে হয় না, ডাক্তারবাবু।

[ শীলা একটা গহনার বাক্সে করে রিঙদুটো নিয়ে আসে। স্বপ্নাবিষ্ট ওর হাঁটা। বাক্সটা এনে মেলে ধরে। ]

ডাক্তার : লক্ষ্মীমেয়ে। বোসো। অরুণ, কেবল শীলা নয়, তুমিও ছোট হয়ে গ্যাছো, তাই-ই শীলা তোমার মুঠোয় ধরে না। তোমারও চোখ ছোট হয়ে গেছে, তাই সব কিছু ছোট ছোট দ্যাখো। তোমাদের দুজনকেই লম্বা হতে হবে। তার আগে তুমি ক্যানভাসের পাখিদুটো নিয়ে এসো। তুমি তো লুকিয়ে রেখেছো, তাই না?

অরুণ : হ্যাঁ, কিন্তু কখন চুরি করেছি জানি না।

ডাক্তার : ঘুমের মধ্যে হেঁটে হেঁটে তুমি যখন হাঁটো, তারই মধ্যে এক সময় ও দুটো খুলে এনেছো। তুমি যাও নিয়ে এসো। যাও।

[ স্বপ্নাবিষ্টের মতো ড্রয়ার খুলে অরুণ একটা রঙের বাক্স ডাক্তারের হাতে এনে দেয় ]

ডাক্তার : এবার তোমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসো, ফিরে এসো। চলে এসো, চলে এসো। [ ওরা আচ্ছন্নতা কাটিয়ে সহজ দৃষ্টিতে তাকায়] নাইস। শীলা, অরুণ—এবার তোমরা বুঝতে পারছো, দুজনেই চোর এবং দুজনেই ছোট হচ্ছো। স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় তোমাদের কথাবার্তা কাজকর্ম তোমাদের মনে আছে?

অরুণ : আছে। আশ্চর্য!

শীলা : আমরা এখন কি করবো, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার : অরুণ, তুমি ঐ রিঙদুটো ক্যানভাসে জুড়ে দাও।

[ অরুণ সুতো সমেত রিঙদুটো ক্যানভাসে ঝুলিয়ে দিলো ]

ডাক্তার : এবার পাখিদুটোকে তোলো।

অরুণ : [বাক্সটা খুলে] একি, সব ডানাগুলো ভাঙাচুরো, রঙ চুরমার হয়ে আছে। কি হবে?

ডাক্তার : কোনো ভাবনা নেই। ঐ রিঙদুটোয় তোমরা দুজনে দুলবে—পাখি চাই না। পাখির চাইতে মানুষ কম নয়। তোমরা যত চলবে, তত লম্বা হবার দিকে যাবে। মনে করো, তোমরা চলেছো, চলেছো, চলেছো।

অরুণ : আমার অদ্ভুত লাগছে, আমি ভয়ানক জোরে চলবো।

শীলা : আমি দেখবো, তুমি কি করে আমাকে ছাড়িয়ে যাও?

শিপ্রা পাল

## দৃশ্যান্তরে অন্ধকার : স্মৃতি নিঃসঙ্গতা

[ সুদেষ্ণার বসবার ঘর। কয়েকটি বেতের চেয়ার, একটি রংয়ের আলমারি। তার ওপর ফুলদানীতে রজনীগন্ধার ঝাড, তার পাশে পেডিষ্টাল লাইট। অন্য দিকে জানালার কাছে একটি ডিভান। মাথার কাছে টেলিফোন।
কেয়া একটি বেতের চেয়ারে বসে আছে, সুদেষ্ণা ডিভানে। কেয়ার সামনে টিপয়ের ওপর কফি তৈরির সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত।
বাইরে বিকেল। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পড়ন্ত রোদ্দুরের রঙে রক্তিম হয়ে উঠেছে আকাশ। ঘরের ভেতরেও সেই রোদ্দুর, আলো, উজ্জ্বলতা। ]

সুদেষ্ণা : সুখ কাকে বলে ?
যার লোভে এতদিন দুঃসাহসী সংকুল প্রান্তর পার হোতে চেয়ে,
বিক্ষত উন্মত্ত আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি।

কেয়া : শুধু তাই ? আর কিছু নয় ?

সুদেষ্ণা : আর কিছু নয়।
অর্থহীন শব্দ ছাড়া সুখ আর অন্য কিছু নয়।

[ একটু থেমে, উঠে দাঁড়িয়ে জানালার সামনে এগিয়ে যেতে যেতে ]

মনে পড়ে কেয়া তোর,
তিন পাহাড়ের গল্প, সূর্যাস্ত বিকেল,
ত্রিকূটের নগ্ন চূড়া,
দার্জিলিংয়ের ম্লান ধোঁয়াটে কুয়াশা !

কেয়া : মনে পড়ে, সব মনে পড়ে।
আরো বেশি মনে পড়ে ইউনির্ভাসিটির দৃশ্য, দ্রুত সব দিন।
শুকনো পাতায় তীব্র রোদ্দুরের অলস উত্তাপ,
হাওয়ায় জলের গন্ধ,
স্খলিত ফুলের গন্ধ
ঝিলের নরম স্রোতে অলস গোপন আর্তি,
আমাদের ভীরু উন্মাদনা !

সুদেষ্ণা : আশ্চর্য ! আমারও সব স্পষ্ট মনে আছে।
কিছুই পারিনি ভুলতে
বৃথা কোন্ সুখের সন্ধানে,
জীবনের দীর্ঘতম মূল্যবান বছরগুলোকে ফিরিয়ে দিলাম।
এখন কি করি ?
নিভৃত নির্জনে এই প্রশ্নের করাত আমাকে দ্বি-খণ্ড করে।

কেয়া : সুখের প্রহর স্থায়ী নয়।
অপার অনন্ত দুঃখ চিরদিন স্থায়ী হয় কারুর জীবনে,,
তাও তো শুনিনি।
অতএব সেইসব অসম্ভব দুঃখ ভুলে গিয়ে,
স্পর্ধিত গৌরবে নগ্ন হৃদয়কে আবার সাজানো অর্থহীন নয়।

সুদেষ্ণা : সবই বুঝি।
তবু যেন কি যে এক ক্ষত বিষণ্ণতা আমাকে উন্মত্ত করে,
উন্মত্ত শ্রান্ত ক্লান্ত করে—
তাই মনে হয়,
পুতুলের খেলাঘর ভেঙে গেলে যেমন সহজ
নতুন পুতুল কিনে খেলা করা,
তেমন সহজ নয় এ জীবন।

কেয়া : কেন নয় ? জীবনের সব দুঃখ দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঈর্ষা বিলাসিতা,
সহজেই মেনে নেওয়া ভালো মনে হয়।
জোড়াতালি দেওয়া তোর জীবনের সেইসব ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি,
এখনো রাখতে চাস সযত্নে সাজিয়ে অ্যালবামে ?

সুদেষ্ণা : ঠিক চাই—তাও নয়।
জীবনের রঙ্গমঞ্চে একদিন যে নাটক শুরু হয়েছিলো,
আজ তার শেষ রাত্রি।
অভিনয় মানুষের পেশা।
তবু ভেবে ত্যাখ—
একই নাটক যদি দীর্ঘদিন অভিনীত হয়,
তার প্রতি স্বাভাবিক নয় কি মমতা ?

[ কেয়া নিঃশব্দে কফি তৈরি করলো। দুটি কফি পূর্ণ পেয়ালা

হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলো জানলার কাছে। ঘরের ভেতরে
ততক্ষণে আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে ]

কেয়া : তোর কফি !

[ সুদেষ্ণা ওর হাত থেকে পেয়ালা নিতে নিতে ]

সুদেষ্ণা : এটা কিন্তু আমারই উচিত ছিলো করে দেওয়া।
[ ম্লান হেসে ] কি যে হয় ! কিছুই লাগে না ভালো।
[ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ] মাঝে মাঝে মনে হয় উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ভিড়ে,
আমিও মাতাল হবো : ভেসে যাবো হাওয়ার শরীরে।

কেয়া : অভ্যাসের অনুসঙ্গে আজও তোর কাছে
সমস্ত সংসার যেন স্থবির জটিল হয়ে আছে।
এরই জন্যে অন্তত কখনোই উচ্ছৃঙ্খল হতে পারবি না তুই,
হলে ভালো ছিলো।

[ ফিরে গিয়ে টিপয়ের ওপর শূন্য পেয়ালা নামিয়ে রাখলো।
তারপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ানো আলোটা জ্বেলে দিতে দিতে ]

কেয়া : প্রেম দুঃখ বিলাসিতা সর্বনাশা সুখ,
সুখ মৃত্যু : অন্তরঙ্গ অপার অসুখ।
অতএব এইসব অস্থির বেদনা ভুলে গিয়ে,
উচ্ছৃঙ্খল হতে চেষ্টা কর।
অনিবার্য পরিণতি যৌবনের মিথ্যে প্রেম, কস্তুরীর মোহ,
পার হলে হয়তো বা অলকা হবে না দুরারোহ।

সুদেষ্ণা : তোর কথা মনে রাখবো, ভুলবো না।
যদি কোনোদিন সব দুঃখ ভুলে গিয়ে জীবনের জটিল দ্বন্দ্বকে,
মেনে নিতে পারি,
যদি হিরণ্ময় হৃদয়ের গোপন গুহায় অগ্নিকুণ্ড নিভে যায় :
অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষার ছবি
সযত্নে সাজাবো তোর কথামতো পুরোনো অ্যালবামে।

কেয়া : অনেকক্ষণ সন্ধ্যে হয়ে গেছে—
এবার তাহলে যাই।
মন শান্ত কর।

[ দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, পেছনে সুদেষ্ণা। তার হাত ধরে ]

কেয়া : কল্লোলের সঙ্গে কাল দেখা হবে তোর ?

সুদেষ্ণা : সম্ভবত। কথা আছে বিকেলে ও আসবে এখানে।
[ একটু থেমে ] কিন্তু কি লাভ ?

কেয়া : ও কথা নাই বা ভাবলি। জীবনটা তোর হিসেবের খাতা নয়
জমা খরচের তালিকাটা, অসম্পূর্ণ থাক্ না এখন।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ সুদেষ্ণার বসবার ঘর। দৃশ্যসজ্জা প্রথম অঙ্কের অনুরূপ। গৃহাভ্যন্তরে সেই বড় পেডেষ্টাল আলোটি জ্বলছে। সুদেষ্ণা বেতের চেয়ারে বসে একটি বইয়ের পাতা অন্যমনস্কভাবে উল্টে যাচ্ছিলো। তার সিঁথিতে উজ্জ্বল স্পষ্ট সিঁদুরের দীর্ঘ রেখা। মনে হলো সে কারো জন্যে অপেক্ষা করছে। তখন প্রায় সন্ধ্যে সাতটা। গ্রীষ্মকাল, জানলা খোলা। হঠাৎ সশব্দে টেলিফোন বেজে উঠলো। সুদেষ্ণা অস্থিরভাবে দ্রুত উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলে। ]

সুদেষ্ণা : হ্যালো পল্লব ? [ কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা গোপন রইলো না ]
আশ্চর্য ! এ সময়ে হঠাৎ আমাকে কি দরকার ?
এখন কোথাও যাওয়া অসম্ভব।
শরীরও তেমন ভালো নয় ; আজ থাক্।

[ টেলিফোনের ওদিক থেকে সুদেষ্ণার সঙ্গে সম্ভবত একটিবার দেখা করবার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করলে পল্লব ]

সুদেষ্ণা : [ অত্যন্ত অসহায়ভাবে ] না না তেমন কিছু মারাত্মক অসুস্থতা নয়।
ট্রাম বাস ট্রাফিকের ভিড় ঠেলে এতখানি পথ,
কেনই বা কষ্ট করে আসবে বলো তো ?
তার চেয়ে ঢের ভালো কাল দেখা হওয়া।
[ একটু থেমে ] কি হলো ? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না ?
আজ থাক। আজ আর ভালো লাগছে না।

[ রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ]

কি আশ্চর্য ! রেখে দিলে নিঃশব্দে এমন
কোনো কথা বললে না।

[ ফিরে এসে ডিভানের ওপর বসে ]

সুদেষ্ণা : [ স্বগত কথন ] কার ডাকে সাড়া দেবো,
কাকে ঘরে ডেকে নেবো, এখনো ভাবিনি।
যা করতে চেয়েছি জানি তাও হয়তো দেরি হয়ে গেছে।

এখন যে অবসাদ শরীরের প্রতিটি গ্রন্থিতে,
এখন যে মনে হয় রক্ত স্রোতে সব উন্মাদনা,
উদ্দাম দুর্জয় ক্লান্ত শান্ত হয়ে গেছে।

[ সুদেষ্ণা উঠে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়ালো ]

এখন বৃষ্টির জলে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে মুগ্ধ চেয়ে থাকা
বুকের দেরাজ খুলে সব ধুলো জঞ্জাল সরিয়ে,
বার বার ছিঁড়ে যাওয়া স্মৃতির ঢাকাই শাড়ি
যত্নে তুলে রাখা ছাড়া অন্য পথ নেই।

[ বাইরে কলিংবেল বেজে উঠলো। কোনো এক প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সুদেষ্ণার চোখের দৃষ্টি। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে সুদেষ্ণা ]

সুদেষ্ণা : [ বিস্মিত ভঙ্গিতে ] একি তুমি ?

[ উদ্‌ভ্রান্তভাবে পল্লব প্রবেশ করলে ]

পল্লব : [ উৎকণ্ঠিত স্বরে ] এখন কেমন আছো ?
হঠাৎ কি হয় যে তোমার, বুঝি না কখনো।
আজ তো যাবার কথা ছিলো, গেলে না যে ?

[ পল্লব একটি বেতের চেয়ারে বসলো, সুদেষ্ণা ডিভানে ]

সুদেষ্ণা : ভালো লাগছে না কিছু।
আজ সারাদিন কি এক অদৃশ্য স্রোতে ঢেউ ভেঙে ভেঙে,
আমার রক্তের স্রোত হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেলো।
তারপর এই সন্ধ্যে থেকে, দুঃসহ সময়গুলো কি করে কাটাবো ভেবে
উন্মাদের মতো আমি অস্থির হয়েছি।
তুমি এলে, ভালো হলো।
কিন্তু জানো, কেন যেন বড় ভয় আমার এ উত্তপ্ত সন্ধ্যাকে।
যে আমার কেউ নয়,
যাকে আমি চাইনি কখনো
সেও কাছে আসে,
যাকে চেয়ে জীবনের দীর্ঘতম মূল্যবান বছরগুলোকে
ফিরিয়ে দিলাম
সেও ফিরে আসে।
কিন্তু কি অন্ধকার, জীবনের কঠিন জিজ্ঞাসা,
আমার বুকের মধ্যে সংহত নিহিত হয়ে আছে।

পল্লব : [ বিনম্র ভঙ্গিতে ] সুদেষ্ণা তুমি জানো
কাকে আমি স্পষ্ট ভালোবাসি।
তুমি জানো, অন্ধকার থেকে আলো কেন সগৌরবে প্রবাহিত হয়,
তুমি জানো এ জীবন শুধুমাত্র অন্ধকার নয়।
কিছুই অস্পষ্ট নয়। শীতল জলের স্বাদ দুপুরের অস্থির রোদ্দুরে
ভালো লাগে।
নদীর নিবিড় মমতায়,
আমরাও খুঁজে নিতে পারি স্নিগ্ধ শান্তির আবাস।

[ সুদেষ্ণা ও পল্লবের দৃষ্টি বিনিময় হলো। পল্লব জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ]

পল্লব : [ অস্পষ্ট স্বরে ] বুঝি না তোমার রক্তে কেন এত অতীত জিজ্ঞাসা
তোলপাড় করে,
বুঝি না আশ্চর্য কোন স্বরচিত বেদনা প্রত্যাশা অন্ধকার ঘরে,
স্থির লক্ষ্য দুর্নিবার নিয়তির মতো কেন তোমাকেই শীর্ণ স্তব্ধ করে ;
তোমার অস্তিত্বে, প্রেমে, শরীরে, অন্তরে।

[ সুদেষ্ণা ডিভানের ওপর একইভাবে হাঁটুতে মুখ রেখে বসে আছে। পল্লব উঠে জানলার সামনে এগিয়ে গেলো। নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো। একটি সিগারেট ধরিয়ে ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বললে ]

পল্লব : যাকে তুমি চাওনি কখনো সে তোমাকে চায়।
দীর্ঘদিন ধরে যাকে হৃদয়ের গোপন গুহায় আমন্ত্রণ জানিয়েছো,
সে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।
নির্মম আলোর বৃত্তে মৃত্যুমুখী এই পরিক্রমা,
একদিন শান্ত হবে।
ঈশ্বরের অপার মহিমা,
সেইদিন হয়তো বা স্থবির বিস্ময়ে
তোমাকে সমৃদ্ধ করবে।

সুদেষ্ণা : [ কম্পিত স্বরে ] আরও বলো পল্লব, আরও বলো।
আমার হৃদয় গর্ভে স্তরে স্তরে শিলীভূত শব্দহীন বিধ্বস্ত বিষাদ,
তোমার আঘাতে সব ভেঙেচুরে চূর্ণ হয়ে যাক।
স্পর্ধার অতীত কোনো অতিকায় সুখের সন্ধানে
কখনো যাবো না আমি।
বাসনার ভগ্ন সিংহাসনে আর কোনো লোভ নেই।

নিশ্চল নিষ্প্রাণ শুদ্ধ কঠিন জমাট মৃত-স্মৃতির আলয় পরিত্যক্ত থাক
সিঁড়িগুলো ক্রমশই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে ;
আমি আর কোনোদিন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠবো না।

[ সিগারেটটা জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে সুদেষ্ণার সামনে এসে দাঁড়ালো পল্লব ]

পল্লব : সুদেষ্ণা ! তোমাকে আমি জীবনে কখনো বেদনা দেবো না
বলেছি অনেকবার।
তবু এতক্ষণ ধরে যা কিছু বলেছি
জানো, সত্যি কোনোদিন বলতে চাইনি।
স্বভাবে সমৃদ্ধ তুমি,
হৃদয়ের ঐশ্বর্যে যখন
নিজেকে সাজাও সেই রক্তমুখী কুসুম স্তবক
তোমার আকাঙ্ক্ষা প্রেম,
প্রচ্ছন্ন গৌরবে দীপ্তিময় হয়ে ওঠে।
কিন্তু তারপর ?
নিঃসঙ্গ বেদনা-দগ্ধ দস্যুতায় নির্মম লুণ্ঠিত
যখন নির্লিপ্ত ক্লান্ত রিক্ত হাতে ফেরো ,
তোমার বধির চুল, তোমার শাড়ির পাড়, দুচোখের নীল নির্জনতা
সজল আকাশ, মেঘ, সম্পূর্ণ দুপুর,
আমি স্তব্ধ হয়ে যাই।

[ ঘরের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে ]

পল্লব : কি উদ্বেগ উত্তেজনা আমাকে উন্মাদ করে।
অভিশপ্ত নিয়তির হাতে যেন মুগ্ধ ক্রীড়নক
ঈর্ষার আগুনে আমি প্রজ্জ্বলিত হই।

সুদেষ্ণা : [ উদ্ভাসিত মুখে ] পল্লব ! তোমাকে আমি ভালোবাসি···
কিন্তু তাকেও ফেরাতে পারি না।
কি যে অভিশাপ !
নিরস্তিত্ব নির্বিকার জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি
আমাকেই বেঁধে নিলো প্রতিশ্রুত ব্যাপ্ত প্রত্যাশায়।

[ পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হলো ]

সুদেষ্ণা : চতুর্দিকে বিচিত্র দেয়াল !

দেয়ালে টাঙানো ধুলো—অস্পষ্ট মলিন ছবি, অন্ধকার ঘর।
জানলার শার্সিতে ম্লান মেঘ ভাঙা রোদ
কিংবা সূর্যাস্তের বিষণ্ণ সংকেত,
ঘোলাটে আলোর বৃত্তে সন্ধ্যার সংলাপ
নতুন চুনের গন্ধ জটিল শহর,
স্মৃতিবহ অনিঃশেষ দীর্ঘ জীবনের ভাঙাচোরা রঙ জলা
জঙ ধরা হৃদয়ের এইসব ছবি,
এর থেকে মুক্তি নেই—মুক্তি নেই কখনো আমার।

## তৃতীয় দৃশ্য

[ সুদেষ্ণার শোবার ঘর। ঘরের একপাশে জানলার ঠিক নিচেই মণিপুরী চাদর ঢাকা একটি নিচু খাট। ঘরের অন্যদিকে অগোছালো এলোমেলো বই ভর্তি একটি বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ঘরের মাঝখানে একটি বড এবং একটি ছোট সোফা। সময় রাত্রি আটটা সাড়ে আটটা! সুদেষ্ণার বেশবাস যত্নহীন। মুখোমুখি দুটি সোফায় বসে আছে কল্লোল ও সুদেষ্ণা। কল্লোলের পরিচ্ছদের পারিপাট্য লক্ষ্যণীয়। ]

সুদেষ্ণা : [ কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর ]
এতদিন পরে তবে আজ কেন এ কথা জানালে।
সমস্ত জীবন ভর উৎসবের স্পন্দিত নিরালা,
তারই অন্তরালে, প্রসাধন কারুকলা এত দুঃখ নির্জনতা ছিলো?
পিচ্ছিল ঘৃণিত স্থির আজ এই অসুস্থ জীবন
সর্পিণীর মতো তীব্র পাকে পাকে জড়াচ্ছে আমাকে
আমি মগ্ন নিশ্চেতন সম্মোহিত অন্ধকার স্রোতে
নিঃশব্দে তলিয়ে যাচ্ছি।
শুধু তুমি, একমাত্র তুমি শুধু এর জন্যে দায়ী।
এ তোমার নির্মমতা!
কে জানতো এ শুধু তোমার ইচ্ছাপূরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়।
[ সুদেষ্ণার কথাগুলো শুনতে শুনতে কল্লোলের মুখে একই সঙ্গে ফুটে উঠলো সংশয় ও বেদনা ]

কল্লোল : এখন যাকিছু বলবো হয়তো তোমার মনে হবে
মর্মান্তিক পরিহাস,
আর তুমি? খেলার পুতুল ছাড়া অন্য কিছু নও!

অদৃশ্য মূর্তিরা এসে ভিড় করবে অন্ধকার গোপন গুহায়।
কিন্তু ভেবে ত্থাখো,
আমিও তো জীবনের মূল্যবান বছরগুলোকে বিলিয়ে দিয়েছি
শুধু শান্তি ফিরে পেতে।
শুধু শান্তি ! শিশিরের মতো ঠাণ্ডা অবিরল অগাধ বিস্মৃতি !
[ তীক্ষ্ণস্বরে ] খ্যাতি, অর্থ, যৌবনের অহঙ্কার
কিছুই পারে না সুখ দিতে,
সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যদি লুপ্ত হয় অসুস্থ নারীতে !
[ ঈষৎ ক্লান্ত বেদনার সঙ্গে ] আমাকে চাও না তুমি ফিরে পেতে
কোনোদিন আর !
আমি ভ্রষ্ট পলাতক জীবনের লুণ্ঠিত সম্মান
আবার ফিরিয়ে দেবো কোন দুঃসাহসে ?
তুমিই তো বলেছিলে এমন স্পর্ধিত ভালোবাসা অন্তত আমার নেই-
আমি ব্যর্থ ক্ষুব্ধ শ্রান্ত জীবনের উদ্দাম মিছিলে
হয়তো হারিয়ে যাবো মেলা ভেঙে গেলে,
কখনো কি মনে পড়ে মেলায় হারিয়ে যাওয়া মুখ ?

সুদেষ্ণা : [ উদ্‌ভ্রান্তভাবে ] মেলা ভেঙে যাক।
অনেক সুন্দর আছে পৃথিবীতে,
অনেক জহুরী শুধুই পরখ করে মূল্যবান রত্ন মুক্তা মণি,
দাম কষে, ছুঁয়ে ত্থাখে : দীপ্ত কিংবা হীন রুচি তার
কে আর অনন্তকাল মনে রাখে।
কিন্তু সেই রত্নের সম্মান অটুট অক্ষুণ্ণ থাকে প্রাচীন সিন্দুকে।
মেলা ভেঙে যাক্।
তবু রঙচটা মাটির পুতুল পুরনো মেলায় কেনা,
আমি একা বুকে তুলে নেবো।
[ অস্ফুট তীব্র স্বরে ] কি ভুল ! কি ভুল ত্থাখো, সব মিথ্যে।
তবু এই হৃদয়ের অবচেতনার অন্ধকারে
তবু এই অনায়াস বুকের গভীরে
এত আলো, স্মৃতি, প্রেম নির্জনতা ছিলো।
নিরুত্তাপ আলিঙ্গনে, শোকে, ক্রোড়ে, লুব্ধ বাসনায়

কত রাত্রি কেটে গেছে : মাতাল রক্তের স্রোত
তবুও উদ্দাম হতে চায় ধমনীর উষ্ণ অন্ধকারে !

কল্লোল : [ সুদেষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে ] সব ভুল, সব মিথ্যে।
সুদেষ্ণা। কিছুই আজকের পৃথিবীতে স্বাভাবিক নয়।
তোমার প্রথম দুঃখ, তোমার একান্ত দুঃখ সহজ সুন্দর !
কিন্তু ছাখো, জীবিকার নির্মম প্রয়াসে
কত ক্লান্ত অসহায় আমার জীবন।
স্নায়ুগুচ্ছে পক্ষাঘাত, চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত এখন,
শিল্প প্রেম একাকার : খসে পড়ে সোনার কলম।
দর্পিত স্বচ্ছন্দ বাহু আড়ষ্ট অক্ষম।

[ উঠে দাঁড়িয়ে—দীপ্ত স্বরে ]

আলিঙ্গনে লোভ নেই : অঙ্গীকারে সমর্পিত ভাষা ;
কপট সজ্জায় মুগ্ধ, নির্মম ক্ষুধায় স্বপ্ন আয়ু ক্ষয় হয়।
আমাকে বিস্মৃত হতে পারো যদি তবে শান্তি পাবে।
[ সুদেষ্ণার সামনে এগিয়ে এসে ] চতুর্দিকে পাপ ঘুরছে
আমাদেরও শরীরে, অন্তরে
প্রচ্ছন্ন গোপন তার অস্তিত্ব ভীষণ :
রক্তের নরকে সেই ইতস্তত ব্যাপ্ত ব্যভিচার
তোমাকেও বিদ্ধ করবে।
সুদেষ্ণা ! কিছুই আজকের পৃথিবীতে খুব বেশি স্বাভাবিক নয়।
উপলক্ষ্য নিয়ে বাঁচা—খেয়ালের উপলক্ষ্য, বেদনার উপলক্ষ্য
স্বাভাবিক নয়, কারুর জীবনে।

[ প্রগাঢ় বেদনার সঙ্গে ]

সুদেষ্ণা : কল্লোল নিজেই জানো না তুমি কি বলছো, কি বলতে চাও।
তুমি কি আমার শুধুমাত্র উপলক্ষ্য ?
খেয়ালের উপলক্ষ্য, বেদনার উপলক্ষ্য ছাড়া আর অন্য কিছু নও ?
তুমি কি আমার জীবন যৌবন নও ? তৃষ্ণার আধার ?
তুমি সেই পানপাত্র—উচ্ছল ভৃঙ্গার। সুতীব্র মাদক রস
রক্তের সন্তাপ। [ গাঢ় স্বরে ] পবিত্র সূর্যের আলো,
বিষণ্ণ প্রত্যাশা। তুমি শান্তি, তুমি দুঃখ, জ্বালাময় রক্তাক্ত বিবেক।

[ কল্লোল উদ্‌ভ্রান্তভাবে ফিরে গিয়ে খাটের ওপর বসলো। কয়েক

মুহূর্ত নীরবতার পর—ধীর স্বরে ]

কল্লোল : আমি কি তা নিজেই জানি না,
কি যে চাই সেও তো বুঝি না।
সুখ বড অবিশ্বাসী, সুখ শুধু সর্বনাশা দুঃখের প্রতীক।
আজ আমি বাজ্যহাবা।
সুদেষ্ণা। এখন সুখ শান্তি আকাঙ্ক্ষাব রাজ্য থেকে
নির্বাসিত তোমাব সম্রাট।
ভুলে যাও, কাঁচ ভাঙা আলমারিব পুরোনো গহ্বরে
ধুলোয় মলিন স্বর্গ :
একটি স্ফটিক বিন্দু—প্রেম যার অন্য এক নাম।
[ অস্ফুট স্বরে—যেন আপন মনে ]
আয়নাকে ভীষণ ভয়।
চিত্রিত দেয়ালে শুদ্ধ জমাট কঠিন ঠাণ্ডা নিঃসঙ্গ দর্পণ,
সে দর্পণে আমি দেখি অন্য মুখ, আবেক আকাশ।
[ ঈষৎ অবসন্ন স্খলিত কণ্ঠে ]

সুদেষ্ণা : বিচ্ছেদ ছাডা তবে অন্য পথ নেই।
আমাব প্রথম দুঃখ, আমার একান্ত দুঃখ সহজ সুন্দব,
এই তবে ধ্রুব সত্য হলো।
কি আশ্চর্য। অমোঘ নিয়তি।
উদ্যত খড়্গ তাব
কখনো এডাতে পাববো না যদিও জানি
এও জানি এই তাব যোগ্য পটভূমি।
যেহেতু আমাব স্ববচিত দুঃখ, তাই তারই হাতে বিদ্ধ হতে চাই।

কল্লোল : বিচ্ছেদ ছাডা আব অন্য পথ নেই।
সুদেষ্ণা। আজ তো নতুন নয়, বহুদিন হলো
হারিয়েছো তুমি সেই রঙচটা খেলার পুতুল
যদিও অম্লান স্মৃতি : তবু জানি অন্য এক কামনাব আলো,
ইচ্ছাব আগুনে জ্বলে পুবোনো গন্ধের মতো
পরিব্যাপ্ত কবে দেবে হৃদয়েব বিষণ্ণ উঠোন।
[ উন্মনভাবে ] অনন্ত আমাব তৃষ্ণা। দুর্নিবার বাসনার জ্বালা
লজ্জাহীন সর্বনাশা তৃষ্ণার আগুন।

সুদেষ্ণা ! তুমি তো জানো আমি ভালোবেসেছি রাত্রিকে।
কর্কশ স্বেদাক্ত তার মুগ্ধ সমর্পণে
আমার বিক্ষুব্ধ মন বুভুক্ষু হৃদয
মগ্ন স্থির নিশ্চেতন নির্মম দুর্বহ।
তুমি জানো আমার হৃদয়,
অখণ্ড নীরব নয় বহু ব্যবহৃত।
সংকীর্ণ পাথুরে ঘরে তবু ভেবে ছাখো ;
আমাকে জ্বালিয়ে তুমি অস্পষ্ট আলোয়
এতদিন ধরে বহু ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখেছো নিজেকে।
[ কণ্ঠস্বরে তিক্ততা গোপন রইলো না ]
কিন্তু কখনো বুঝতে চাওনি
আমাদের তৃপ্তির উৎস সেই দীর্ঘ অন্ধকাব
আমবা সবাই অন্ধকাব ভালোবাসি।
বিশ্বস্ত গভীর নগ্ন ঘৃণায় বধির
রাত্রির লাঞ্ছনা-স্পষ্ট নির্লজ্জ প্রণয় ; আদমেব আদি পাপ।
[ হঠাৎ দৃঢ়স্বরে ] আব কোনো প্রয়োজন নেই।
সুদেষ্ণা ! আবাব বলছি, স্বাভাবিক হতে চেষ্টা কবো।
হৃদয়ের প্রথম কথা
তাকে জানো, তাকে বোঝো, স্বাভাবিক হও।
বৃথা আত্মজিজ্ঞাসায় অবসন্ন স্থৈর্যহীন কেন
অনিঃশেষ অবিরত কালোত্তীর্ণ তোমাব প্রত্যাশা ?
অন্য এক প্রতীক্ষায়, অন্য এক প্রতিজ্ঞায়
আবদ্ধ তোমার সমগ্র অস্তিত্ব-সত্তা উন্মুখ হৃদয়।
[ বিচলিত ক্লান্ত কণ্ঠে বুকের বিষণ্ণ ঘরে তোমার বেদনা অনন্ত অপার
আর আমারও হৃদয়ে নিবিড় আশঙ্কা, আর্তি,
অন্তরঙ্গ জরতী উত্তাপ।
সুদেষ্ণা : [ স্বগতোক্তি ] সময় ফুবোলে, ভালোবাসা শেষ হয়।
সময় ফুরোলে, আমরাও এক সূত্রে গেঁথে নিতে পারি
সব হারানো অকিঞ্চন।
বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে যত্নে গড়ি স্মৃতির মিনার।

কল্লোল! আমার যা দুঃখ শ্রান্তি বেদনার ভার,
তোমার বিস্তৃত হাতে এতদিন তুলে দেবো ভেবে প্রতীক্ষা করেছি।
আজ সব ভুল, মিথ্যে মনে হলো।

[ সুদেষ্ণার দিকে তাকিয়ে ]

কল্লোল : আজকের পৃথিবীতে যাকে তুমি ভুল ভাবো
সেই ভুল হয়;
সত্য মনে হলে সব সত্য ছাড়া আর কিছু নয়।
গভীরে তাকিয়ে ছাখো,
আমাদের সকলেরই হৃদয়ের খাঁজে খাঁজে রক্ত চুঁয়ে পড়ে,
ফোঁটা ফোঁটা দুঃখ স্মৃতি ভালোবাসা
শিশিরের মতো উষ্ণ অন্ধকারে ঝরে।

[ সুদেষ্ণা উঠে দাঁড়ালো, জানলার দিকে এগিয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর

সুদেষ্ণা : কল্লোল। আমি তো জানি আমাকে তোমার কত
প্রয়োজন ছিলো,
তোমাকে আমারও কম প্রয়োজন নয়।
[ দীপ্ত স্বরে ] কিন্তু অসম্ভব, তোমার সাজানো ঘরে
নকল ইচ্ছার ভারে দীপ্তিহীন কাগজের ফুল হয়ে বাঁচা।
বরং এখন ভালো;
[ উদ্ভাসিত মুখে—গাঢ় স্বরে ] অবিন্যস্ত অস্পৃশ্য বাসনা,
আমাদের চারপাশে উন্মোচিত অন্ধকারে জ্বলুক জ্বলুক।
বিপর্যস্ত হাওয়া এসে মুছে নিক স্বেদাক্ত শরীর,
অবেলায় বৃষ্টি এসে ধুয়ে দিয়ে যাক পাপ, যাকিছু পুরোনো।

কল্লোল : [ উঠে দাঁড়িয়ে ] জানতাম আমাকে তুমি দু'হাত বাড়িয়ে,
কখনো পারবে না আর বুকে তুলে নিতে।
অথচ তোমার মধ্যে আরও কিছুকাল
আমার অস্থির দেহ, বুভুক্ষু হৃদয় সুখ শান্তি চেয়েছিলো!

[ বেদনা ও সংশয় ক্লান্ত কল্লোল নেপথ্যে নিষ্ক্রান্ত হতে হতে, একটু থেমে

কল্লোল : লক্ষ্যহীন দীর্ঘতম জীবনের অনেক বছর
এখনো হয়তো বাকি।
কামনা জর্জর অনুশোচনায় ব্যর্থ কালরাত্রি ছাড়া
কে বলতে পারে তারা অর্থহীন, অন্য কিছু নয়।

[ সুদেষ্ণা জানলার সামনে থেকে এগিয়ে এলো। কল্লোলের মুখোমুখি দাঁড়ালো। পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হলো ]

সুদেষ্ণা : [ বিনম্র কণ্ঠে—অনুনয়ের ভঙ্গিতে ]

শোনো, আমি বহুপথ পার হয়ে নিসঃঙ্গ একাকী
অক্লান্ত বাসনা-দগ্ধ আসন্ন সন্ধ্যায় এই মায়ার দর্পণে,
সুগন্ধি শরীর, স্বপ্ন, যৌবনের বিচিত্র স্বরূপ,
প্রতিফলনের দৃশ্য কি বিধ্বস্ত রক্তাক্ত দেখেছি,
অতঃপর পরাজিত : ভালোবাসা খুঁজে খুঁজে দৃশ্যে ফিরে গেছি।
এবার আমাকে তুমি মুক্তি দাও
এইসব আলো, স্মৃতি, নির্জনতা থেকে।

কল্লোল : এই মৃত শোকার্ত শহরে।
দীর্ঘদিন রাত্রি ধরে হৃদয়কে ব্যবহার করে
তোমারও হৃদয় আজ
শহরের মতো অন্ধ স্থবির জটিল হয়ে গেছে।

[ কল্লোল বিষণ্ণ দুর্বল পদক্ষেপে নেপথ্যে নিষ্ক্রান্ত হলো ]

সুদেষ্ণা : [ নম্র বেদনা-বিচলিত কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করবার ভঙ্গিতে ]

এই মৃত নিঃসঙ্গ শহরে
অবিশ্বাস বিষাদের দীর্ঘ সমারোহে,
বহুদিন রাত্রি ধরে হৃদয়কে ব্যবহার করে
আমারও হৃদয় আজ,
কঠিন নিষ্প্রাণ ঠাণ্ডা জমাট দর্পণ হয়ে গেছে।

[ একটু থেমে, উদ্‌ভ্রান্তভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে

কি বললে ? সব ভুল, সব মিথ্যে ?
হয়তো বা…
তবুও কল্লোল,
আমার সমস্ত স্মৃতি
তোমার রক্তের কাছে ঋণী।

অসিত সরকার

# মহুয়া মিলানের হাট

---

হাজারিবাগ জেলার ছোট্ট একটি রেলষ্টেশন, পাথরাতু। পাহাড়ী শাল আর মহুয়ায় ঘেরা। নির্জন। সারাদিনে দুটি ট্রেন যায় আর আসে। একটি ভোরে, অন্যটি রাত্রে। দ্বিতীয় শ্রেণীর খুব সাধারণ একটা ওয়েটিং রুম। কেউ নেই। একেবারে নিঃসঙ্গ। বাইরে প্রচণ্ড শীত, একটানা ঝিঁঝির ডাক। অন্ধকার। অনেক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর—সিগন্যালের আলো, ট্রেনের আওয়াজ, বাঁশির শব্দ। ট্রেন চলে গেলে আবার সেই নিটোল নিস্তব্ধতা।

ষ্টেশন মাষ্টার : [ বাইরে থেকে ] আসুন, ভেতরে আসুন
এইখানে বসুন [ দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে ]
ভোরের আগে তো আর কোনো
ট্রেনই পাবেন না।

যুবক : অতএব একটু বিশ্রাম কিংবা নিদ্রা ছাড়া
আপাতত কিছুই করার নেই···

[ ফ্লাস্ক, অ্যাটাচিটা টেবিলের ওপর রাখে ]

ষ্টেশন মাষ্টার : কিছুই করার নেই !

[ দরজার দিকে এগিয়ে যায় ]

যুবক : শুনুন।

ষ্টেশন মাষ্টার : বাইরে ঝড়ের শব্দ, হিমেল তুষার, আগে
জানলাটা বন্ধ করে দিন।

যুবক : আপনি কি এখুনি চলে যাবেন ?

ষ্টেশন মাষ্টার : হ্যাঁ, আমার যে একটু
কাজ আছে, জরুরী ডাকের বিলি।

যুবক : [ স্বগত হতাশ স্বরে ] এত ডাক
কোথা থেকে আসে, কেন আসে, তাও বা জরুরী,
[ স্বাভাবিক ভাবে ] বসুন না, একটু গল্প করে।

ষ্টেশন মাষ্টার : আচ্ছা, হাতের কাজটা তাহলে আগে শেষ করে আসি।

[ প্রস্থান। যুবক টিন থেকে সিগারেট ধরাতে ধরাতে চারদিকে তাকালো। পরনে গরমের সুট। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা এবং শোভন ভঙ্গি ]

যুবক : বাইরে ঝড়ের শব্দ, অতএব জানলাটা খোলা থাক
[ উঠে জানলা খুলে দিলো ] আঃ,
কি হিমেল বাতাস,
হাওয়া আসুক, হাওয়া আর অন্ধকার—
বাইরে ঝিঁঝির ডাক, অন্ধকার, ঝড় আর জোনাকির কাল।
আমাদেরও গ্রামে একদিন বাঁশবন ছিলো
শন্‌শন্‌ হাওয়ার শব্দ, অন্ধকার আর
জোনাকির কাল।
কিন্তু বাইরে এত অন্ধকার কেন, হাওয়া
জ্যোৎস্নায় পাহাড় ফাটে না কেন
শালবন, মহুয়ার ঝাড় !
কি অদ্ভুত এই নৈঃশব্দ্য পাহাড়ী দেশ
যেন কি নিঃসঙ্গ বেদনা-বিধুর···
আঃ, ধুলো নেই, বাতাসের ঘূর্ণি ওঠে কৃষানীর বুকের মতন—

ষ্টেশন মাষ্টার : কৃষানীর পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের মতো
কলতান ফোটে, মুঠো মুঠো বৃষ্টির ফোঁটা যখনই
মুক্তোর মতো পাথরের বুকে ছিটকে ছিটকে পড়ে···

যুবক। [ জানলার কাছ থেকে সরে এসে ] বাঃ,
বেশ বলছেন তো আপনি,
ঠিক যেন কবিতার মতন :
কৃষানীর পায়ের বাঁধা ঘুঙুরের মতো কলতান ফোটে,
মুঠো মুঠো বৃষ্টির ফোঁটা যখনই মুক্তোর মতো
পাথরের বুকে ছিটকে ছিটকে পড়ে···
[ চেয়ারে বসে পড়ে ] আপনি কি কবিতা লেখেন ?

স্টেশন মাষ্টার : না, কবিতা লিখি না [ বসে ] কবিতা
লেখার অবকাশ কোথায়—
কেবলই আপ অ্যাণ্ড ডাউন, আপ অ্যাণ্ড ডাউন,
তবে মাঝে মাঝে 'দেশ' আসে, পড়ি।

যুবক : বাঃ, চমৎকার বলেছেন তো—
কেবলই আপ অ্যাণ্ড ডাউন, আপ অ্যাণ্ড ডাউন।

সত্যি, আপনাকে পেয়ে এই নিঃসঙ্গ অন্ধকারে
কি যে ভালো লাগছে আমার !

স্টেশন মাষ্টার : দাঁড়ান, আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

যুবক : না না, চা তো আমারই সঙ্গেই আছে…ফ্লাস্কে

[ যুবক ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালে । বাইরে অন্ধকার কেটে গিয়ে জ্যোৎস্না উঠেছে। দূর শাল পিয়ালের বন থেকে ভেসে আসছে ঝড়ের শব্দ, সাঁওতালি গান আর মাদলের সুর ]

আচ্ছা মাস্টার মশাই—
কাছে পিঠে এখানে কোথাও ঝরনা নেই ?

স্টেশন মাষ্টার : অনেক, অজস্র ঝরনা আছে।
এখানে চারদিকে তো কেবল পাহাড় আর পাহাড।
তবে মানচিত্রে আঁকা
উল্লেখযোগ্য কোনো ঝরনার নাম নেই—
অজস্র ছোট ছোট পাহাড়ী ঝরনা
কাঠবেড়ালির দুষ্টু পায়ের মতো কেবলই
লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেছে দূরে।
কোথায় যাবেন আপনি ?

যুবক : থারমল পাওয়ারের ডাক বাংলায়,
দুদিনের জন্যে এখানে বেড়াতে এসেছি

স্টেশন মাষ্টার : এখানের পাহাড় অসহ্য রুক্ষ বড়, একলা কেন এলেন ?

যুবক : [ অনেকটা স্বগত স্বরে ] একলা ছাড়া
কে আমার আছে, কবেই বা ছিলো [ সহজ স্বরে ] তাছাড়া
পাহাড় তো আমার খুবই ভালো লাগে, যেন
কি বিপুল মগ্নতার মাঝে
নিজেকে কষ্ট দেওয়া, নিজেকে ভালোবাসা—
ঠিক যেন…

স্টেশন মাষ্টার : [ হাসতে হাসতে ] ঠিক যেন কিছুরই মতো না,
শুধু বিপুল বিস্ময়ে মগ্ন ম্লান হওয়া !

যুবক : সত্যিই, ঠিকই বলেছেন—মগ্ন ম্লান হয়ে
হৃদয়ের অতল থেকে যেন এক

গভীর দুঃখকে বাইরের আলোতে টেনে আনা।
আচ্ছা, ভোরের আগে তো আর কোনো ট্রেন নেই?

স্টেশন মাষ্টার : কোনো ট্রেন নেই। আপনি একটু বসুন,
আমি এখুনি আসছি।

[ মাষ্টার দ্রুত পায়ে চলে গেলে, যুবক একটা পত্রিকার পাতা ওলটাতে থাকে। একটু পরে মুড়ে রেখে, যেন কিছু ভালো লাগছে না এমনি ভাবে, একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে সাঁওতালি গান আর মাদলের সুর। সহসা ট্রেনের শব্দে সে যেন চমকে ওঠে। তারপর বাঁশির শব্দ। একটু পরেই প্রচণ্ড শব্দে ট্রেনটা চলে গেলো। যুবক আবার তার চেয়ারের কাছে এসে, দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে—ভেবে ভেবে, মাঝে মাঝে জানলার দিকে তাকিয়ে কি যেন লিখতে শুরু করে। টেবিলের ওপর ছড়ানো পত্রিকা, সিগারেটের টিন, দেশলাই, ফ্লাস্ক ইত্যাদি। বেশ কিছুক্ষণ পর কাটাকুটি করে কবিতাটা নিজেই পড়তে থাকে ]

যুবক : তোমার এ সরাইয়ে কি কি পাওয়া যাবে মাসী
খাদ্য মদ্য মাংস পানীয় এবং দু একটি আপেল
হিমানীর মতো সাদা ফুল কিছু, সঙ্গিনী এবং উষ্ণতা।
বহুদিন নিঃসঙ্গ ছিলাম আমি, এবং এখনো একা।

যদি পারো কিছু উষ্ণতা ধার দিও মাসী, এবং
মনোমতো সঙ্গিনী পাওয়া গেলে ভেবেছি কিছু দিন
থেকে যাবো নির্জন পাহাড়ের নিচে ছোট্ট সরাইয়ে।

খৈয়ামের একখানা বইও আছে কাছে, নিশ্চয়ই
কাছেই কোথাও ঝরনা পাওয়া যাবে, দেখেছি
আসার পথে ট্রেনে, সারি সারি পাইনের ফাঁকে
হরিণের তৃষিত চোখ ঊর্দ্ধমুখ আকাশের গায়ে।

তুমি তো সবই জানো মাসী, যদিও সারারাত এখানে
বরফ পড়ে, তবু কেউ ছাড়া এ হৃদয় ধু-ধু কালাহরি,
সঙ্গিনীর উষ্ণতা ছাড়া মাসী একরাতেই শীতে জমে যাবো।

[ কবিতা শেষ হলে যুবক নিজের মনেই হাসে। মাষ্টার মশাই ফিরে এলেন। চাদরটা ভালো করে গলায় জড়িয়ে চেয়ারে বসে বিড়ি ধরালেন ]

স্টেশন মাষ্টার : এবার তাহলে নিশ্চিন্ত মনে কিছুটা গল্প করা যাবে, কি বলেন ?
কি মশাই, একা একা খারাপ লাগছে বুঝি ?

যুবক : না না, খারাপ ঠিক নয়, এই একটু…

[ মাথার পেছনে হাত রেখে, হাই তুলে আড় মোড়া ভাঙে ]

স্টেশন মাষ্টার : [ হাসতে হাসতে ] এই একটু কি ? কবিতা পড়ছিলেন ?
[ সহসা দরজার দিকে তাকিয়ে ] আরে, আসুন আসুন…

[ যুবক অবাক চোখে দরজার দিকে তাকায়। চব্বিশ পঁচিশ বছরের আশ্চর্য শোভন রূপসী এক তরুণী। তরুণী পায়ে পায়ে ভেতরে এগিয়ে আসে ]

একি ! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন।

[ তরুণী সসংকোচে চেয়ারে বসলো। হাতের ঝোলানো ব্যাগটা টেবিলে রেখে রুমালে মুখ মুছলো ]

তরুণী : আচ্ছা, এখানে কোনো লোক দেখছি না কেন ?

স্টেশন মাষ্টার : এই শীতের রাতে, এমন ছোট্ট স্টেশনে—
তাছাড়া, এই তো সবাই রয়েছি—আপনি, আমি, উনি
এবং আসার পথে
প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে দেখেননি, সবাই কেমন
নিশ্চিন্ত আরামে মুড়িসুড়ি দিয়ে গভীর নিদ্রায়
লীন হয়ে আছে ?

[ মেয়েটি বড় বড় চোখ তুলে তাকায় ]

আপনার মতো উনিও যাত্রী,
আমি স্টেশন মাষ্টার…

তরুণী : [ বিস্ময়ে ] ও, তাই নাকি ! আচ্ছা ! নমস্কার।

স্টেশন মাষ্টার : [ রসিকতা করে ] কোলকাতার ধুলোর গন্ধ
বাতাসের শব্দ শুনি যেন শাড়ির আঁচলে ?

তরুণী : হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। কোলকাতা থেকেই এসেছি আমি
'ডাক ও তারের' চাকরি নিয়ে
হিন্দেগীরে।

[ যুবক আর একবার মেয়েটির দিকে চোখ মেলে তাকায় ]

স্টেশন মাষ্টার : ও, আচ্ছা আচ্ছা ! তাহলে তো
মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা হবে—

অন্তত মহুয়া মিলানের সাঁওতালি হাটে।

[ সহসা পাখি ডেকে উঠলো। ভোরের কোমল আলোর রেখাগুলো। এসে পড়েছে জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে ]

আপনি তো
ছোট্ট একটা টমটম ভাড়া নিতে পারেন।
হিন্দেগীর খুবই কাছে, ঠিক বাঁধের ওপারে,
দুদিকে শালের বন, মহুয়া, পিয়াল—
মাঝখানে নদীর রেখার মতো
পাহাড়ী মাটির পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে দূরে
বেশ ভালোই লাগবে।

তরুণী : [ চমকে ওঠে ] ও, তাই নাকি !

স্টেশন মাষ্টার : তাহলে আসুন,
আমিই টমটমের সব ব্যবস্থা করে দিই—
[ যুবককে ] আপনি একটু বসুন, আমি এখুনি আসছি।

[ ওরা দুজনে চলে যায় ]

যুবক : [ একটু নিস্তব্ধতার পর, দরজার দিকে তাকিয়ে যেন অনেকটা স্বগত স্বরে ] এ মুখ
কি আশ্চর্য চেনা, কত পরিচিত, কারুকার্য করা
সেই চোখ, হাসির নিটোল বৃত্ত
যেন কত কত চেনা, আহা পাহাড়ী ঢল বেয়ে নামা
যেন স্বচ্ছ নদীরেখা,
অথচ স্পষ্ট জানি—এর আগে ওকে আমি
কোনোদিন কোনোখানে কোথাও দেখিনি—
আশ্চর্য, কেন যে এমন হয় !

[ দূরে, অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ট্রেনের শব্দ ]

পৃথিবীতে কিছু কিছু মুখ থাকে,
দেখলেই মনে হয় যেন কোথায় দেখেছি তাকে,
কি ভীষণ চেনা লাগে, যেন কতদিন
একসাথে ঘুরেছি পার্কে, বাগানে—হাতে হাত রেখে
বিকেলের পড়ন্ত ছায়ায় গভীর তন্ময়…

[ টেবিলে কনুই রেখে, দুহাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে। ট্রেন ছাড়ার বাঁশি শোনা যায়। স্টেশন মাষ্টার দ্রুত পায়ে প্রবেশ করে ]

স্টেশন মাষ্টার: একি! আপনি এখনো বসে, যাননি?

যুবক: [ মুখ তুলে ] ভেবেছি আমি আর ওখানে যাবো না···

স্টেশন মাষ্টার: সেকি! ট্রেন যে ছেড়ে দিলো, শিগগির,
আসুন আসুন···

[ মাষ্টার ওকে প্রায় হাত ধরেই টানতে টানতে নিয়ে গেলো। সাথে সাথে একটু একটু করে ট্রেন ছাড়ার শব্দ। মঞ্চ থেকে আলো কমে গিয়ে অন্ধকার। যেন দুহাতে সমস্ত আলো কে ঢেকে দিয়েছে। শুধু অন্ধকারের মধ্যে সিগন্যালের সুতীব্র ছোট্ট সবুজ আলোটা দুলে দুলে কেঁপে যাচ্ছে আর অন্ধকারের ওপার থেকে শোনা যাচ্ছে যুবকের কণ্ঠস্বর—আহত, ম্লান ]

যুবক: আচ্ছা, মাষ্টার মশাই—মহুয়া মিলানের
সাঁওতালি হাট এখান থেকে কত দূর,
কবে কবে বসে—
দুদিকে শালের বন, মহুয়া, পিয়াল—
মাঝখানে নদীর রেখার মতো
পাহাড়ী মাটির পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে দূরে
হিন্দেগীর বাঁধের ওপারে···
বিপন্ন নৌকার মতো
সমস্ত সত্তা আমাকে সেইখানে নিয়ে যাক
মহুয়া মিলনের সাঁওতালি হাটে
আমি আর যাবো না অন্য কোনোখানে।

[ ট্রেনের শব্দটা মিলিয়ে গেলো দূর দিগন্তে ]

**অসিত সরকার**

# তমাল অরণ্যে

হাজারিবাগ জেলায় রুমাণ্ডির সংরক্ষিত নিবিড় অরণ্য অঞ্চল। দুপাশে সারি সারি সাজানো শাল পিয়াল মহুয়া। সবে তখন বিশাল সূর্য ডুবে গিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে অন্ধকার। চিত্রা একা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পাতায় পাতায় হাওয়ার বিচিত্র শব্দ। পরদা উঠলে দেখা যাবে মঞ্চ আবছা অন্ধকার। চিত্রা একা। দুচোখের পাতায় জড়ানো তার অজস্র উচ্ছলতা, তন্ময় ভালো লাগা, তার সাথে আবাহসংগীতে মৃদু রবীন্দ্রসংগীতের সুর: শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে।

চিত্রা : সংগীতের মতো পাতায় পাতায়
একি বিচিত্র শব্দ, সুর—সম্মোহিত হাওয়া
সাপুড়ে বাঁশির মতো আমাকে ডেকে নিয়ে যায় দূরে
যেন তন্বী সাপিনী আহা!

[ চিত্রাকে আবছা বোঝা যাবে। শাড়ির আঁচল, খোলা চুল বাতাসে উড়ছে। হাওয়ার শব্দ বাড়ে ]

হাওয়ার শব্দরা বাড়ে, দূরে, অরণ্যের নীলে
কে যে আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে তন্ময়
নিয়তির মতো রূঢ় হাতে আহা!
আর আমি সেখানে গাছেদের সাথে
মিশে গিয়ে গাছ হয়ে যাবো, আমার স্তব্ধতার ভাষা হবে ফুল,
শাখায় শাখায় আন্দোলিত মুঠোমুঠো পাখি,
আমি কবে যে অরণ্যের সাথে মিশে গিয়ে
সবুজে সবুজ অরণ্য হয়ে যাবো সেই কথা ভাবি।

[ ঝড়ের মতো হাওয়ার শব্দ বাড়ে। তার সাথে রবীন্দ্র সংগীতের সেই একই সুর: তমাল-অরণ্যে ওই শুনি শেষ কেকা ]

আমার বুক থেকে সূর্য উঠবে, সমুদ্রের মতো
থৈ থৈ সবুজে নীলে টুকরো টুকরো মেঘ,
শাখায় শাখায় আমি আকাশে আন্দোলিত হবো,

কিন্তু এত অন্ধকারে ·

[ মঞ্চ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে দুরন্ত হাওয়ার শব্দ বাড়ে। শোনা যায় সেই স্বর : সময় পাবে না আর, নামিছে অন্ধকার ]

না না, অন্ধকারে অরণ্য আশ্চর্য স্তব্ধ যেন অন্যভাষা
অপরিচিত কেউ। বিশাল সত্তার মতো
কি নিঃসঙ্গ একা। নিজেকে কেমন যেন অসহায় করুণ লাগে,
এত স্তব্ধতার মাঝে অতলের সমস্ত বীণাগুলো যেন
একসাথে বেজে যায়, হেমন্তের রিক্ত মাঠ
করুণ কান্নার মতো হু হু কোরে ছুটে আসে হাওয়া
নিঃস্ব বেদনার মতো বুকে বাজে—অসহ্য, অসহ্য, আঃ !

[ চিত্রার কণ্ঠস্বর এখন আর্তনাদের মতো মনে হলো। হাওয়ার শব্দ কমে আসে। গাঢ় হয়ে নেমে আসে অন্ধকার। পথ হারিয়ে চিত্রা সারা অরণ্য ছুটোছুটি করে বেড়ায়। এই সময় মঞ্চের চারদিকে নানা রঙের আলোগুলো দ্রুত ঘুরবে। তার সাথে সেই স্বর : আলো-আঁধারে পথিক যে পথ ভোলে। চিত্রার খোলা চুল এলোমেলো বাতাসে উড়ছে। স্পষ্টই বোঝা যাবে ও ভীষণ ভয় পেয়েছে ]

একি বিচিত্র শব্দ, ভয়ঙ্কর—হাওয়ারা উন্মাদ যেন
পিশাচিনী পিশাচিনী, কি করেছি আমি !
[ আর্তস্বরে ] আঃ, এত অন্ধকারে এখন কোথা যাই
কি যে করি—কোনো পথ নেই, আলো

[ এমন সময় অরণ্যের বিচিত্র শব্দ শোনা যাবে। কালো পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢাকা তিনজন, অর্থাৎ তিনটি গাছ—শাল পিয়াল মহুয়া সমান দূরত্ব রেখে চিত্রাকে ঘিরে ধরবে এবং চিত্রা মঞ্চের যেখানেই যাবে, অর্ধবৃত্ত রচনা করে ওকে বিহ্বল করে তুলবে। গাছেরা প্রবেশের সাথে সাথে পরিচয়ের ভঙ্গিতে বলবে ]

শাল : আমি শাল।

পিয়াল : আমি পিয়াল।

মহুয়া : আমি মহুয়া।

পিয়াল : এ এক আশ্চর্য রূপকথার দেশ।
মহুয়া : শাল পিয়াল আর মহুয়ায় ঘেরা
লাবণ্যোজ্জ্বল গাছেদের স্বপ্নময় এ এক আশ্চর্য রূপকথার দেশ
শাল : মূরেদের গায়ের রঙের মতো কালো তার নিঃসঙ্গ
রিক্ত অন্ধকার
মহুয়া : যখনই বাতাস বয়, দুরন্ত ঝোড়ো হাওয়ায়
আশ্চর্য মিষ্টি একটা মর্মর ঝরে ঝরে পড়ে।
পিয়াল : আর ঝোড়ো হাওয়ার অনন্ত সঞ্চয়
শাখায় শাখায় যখনি প্রতিধ্বনিত হয়, অশান্ত ঊর্মিল
শাল : তখনি অরণ্যের রুদ্ধতা যেন বিপুল উল্লাসে
ফুলে ফুলে ওঠে, বিশীর্ণ পাখিদের করুণ আর্তনাদে।
চিত্রা : [ পাগলের মতো আর্তস্বরে ] আঃ,
একি আশ্চর্য ভয়ঙ্কর—কি নিঃসঙ্গ একা
যেন সমুদ্র নদী সঙ্গম-উন্মত্ত দুটি হিংস্র বাঘিনী
অজস্র অন্ধকার মোহানার চাপে ক্লান্ত
শ্রান্ত হয়ে আছে।
মহুয়া : শুধু পাখিরাই জানে আমাদের ক্লান্ত নিঃসঙ্গতা।
পিয়াল : শাখায় শাখায় নীড় বাঁধে।
মহুয়া : আমাদেরই মাঝে পত্র পুষ্পে গুচ্ছ গুচ্ছ ডানা মেলে ওড়ে।
পিয়াল : গলায় সমস্ত নদীকে বেঁধে ঝরনার গান গায়।
শাল : ব্যাধের পায়ের মতো নিঃশব্দ অন্ধকারে পাখিরাই শুধু
আমাদের নিস্তব্ধতার সাথী।

[ এখন ঝড়ের মতো বাতাসের দুরন্ত শব্দ ]

পিয়াল : দুরন্ত বাতাস বয়।
মহুয়া : সংগীতমুখর।
পিয়াল : ক্রন্দনরত।
মহুয়া : মৃত্যুলীন।
শাল : যেন আহত পশুর ক্রুদ্ধ ক্রন্দন।
মহুয়া : অশান্ত ঊর্মিল।

চিত্রা : ডাইনীর চোখের মতো আঃ কি ভীষণ অজানা অন্ধকার !

পিয়াল : ওর কেউ নেই।

শাল : ওর কেউ নেই।

মহুয়া : ওর জন্ম যেন ললিত ইচ্ছায়।

শাল : ওর মৃত্যু যেন ইচ্ছার অন্য হাতে বাঁধা।

[ সহসা অরণ্যে ক্ষীণ একটা আলোর রেখা দেখা গেলো। সাঁওতালি মাদলের দ্রিমি দ্রিমি সুর, যেন অনেক দূর থেকে ]

চিত্রা : [ আত্মহারা হয়ে ] আলো। আলো ! আঃ,
আলো কোথা থেকে এলো। তবে কি ওখানে কেউ আছে,
আমি ওইখানে যাবো।

[ চিত্রা টলতে টলতে পাগলের মতো ছোটে। চুলগুলো ওড়ে দুরন্ত ঝড়ে। মঞ্চের আলো দ্রুত ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকার হয়ে যাবে। অন্ধকারের ওপার থেকে শোনা যাবে গাছেদের কণ্ঠস্বর ]

মহুয়া : ওর কেউ নেই।

পিয়াল : ভালোবাসা ?

শাল : হারিয়ে এসেছে যেন
যৌবনের অতীত কোন্ অজানা অন্ধকারে।

[ বিরতি ]

মহুয়া : ও এখন নিঃসঙ্গ একা।

পিয়াল : ও এখন গোপন অন্ধকারে মোড়া।

শাল : ও এখন মৃত্যুর নগ্ন হাতে ঢাকা।

[ থেমে গেলো কণ্ঠস্বর। একটি জানলা স্পষ্ট আলোকিত। বনরক্ষক অঞ্জনের ডাকবাংলো। চিত্রা ভয়বিহ্বল পাগলের মতো দরজায় আঘাত করলো ]

চিত্রা : কে আছো, দরজা খোলো,
আমি হারিয়ে গেছি—দরজা খোলো, দরজা খোলো,

[ ঝিঁঝির ডাক। অস্পষ্ট মাদলের সুর ]

আমার পেছনে এখন মৃত্যুর মতো
ওত্ পেতে রয়েছে অজস্র অজানা অন্ধকার, ভয়।

কে আছো দরজা খোলো, দরজা খোলো। ·

[ একজন বৃদ্ধ মুড়িসুড়ি দিয়ে হাই তুলতে তুলতে, দরজা খুলে হ্যারিকেন নিয়ে বেরিয়ে এলো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলোটা একটু বাড়িয়ে বিস্ময়ে চিত্রার মুখের সামনে তুলে ধরলো ]

অরণ্যের অজস্র অজানা অন্ধকারে হারিয়ে গিয়ে আমি
ভীষণ ভয় পেয়েছি। এখানে কি কেউ আছে?

বৃদ্ধ : এই তো আপনি, আমি, দাদাবাবু এখানে রয়েছেন।
আসুন, ভেতরে আসুন।

[ বৃদ্ধের সাথে চিত্রা ভেতরে আসে। বৃদ্ধ হ্যারিকেনটা টেবিলে রাখে টেবিলে একটা হাতের ওপর মাথা রেখে অঞ্জন গভীর ঘুমিয়ে। মুখের একটা অংশ তার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ক্লান্ত। অবিন্যস্ত চুল। পরণে পায়জামা পাঞ্জাবী। টেবিলে হুইস্কির বোতল, পেগ। পেগটা ওলটানো। কোলের ওপর খোলা একটা কবিতার বই—'বেলা অবেলা কালবেলা'। সামনের দেওয়ালে বিশাল একটা বিমূর্ত চিত্র। ডানদিকে জানলার নিচে পরিষ্কার বিছানা। একপাশে কাঠের ছোট্ট সেল্‌ফে দেশীবিদেশী কিছু কবিতার বই। মোটকথা ডাকবাংলো যেমন হয়, অঞ্জন ছাড়া আর সব কিছুই বেশ সুন্দর সাজানো। চিত্রা অপলক। তার পায়ের কাছে মেঝেতে ঢেকে রাখা অঞ্জনের খাবার। বৃদ্ধই প্রথম স্তব্ধতা ভাঙে ]

বৃদ্ধ : বাবু এখন ঘুমিয়ে, আপনি বসুন।

চিত্রা : ও, হ্যাঁ!

[ বিছানার নিচে থেকে বেতের মোড়াটা নিয়ে বসে ]

[ আঁচলে মুখ মুছে ] আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারো?
কি নাম তোমার, কি বোলে ডাকবো?

বৃদ্ধ : [ ম্লান হেসে ] আমার কোনো নাম নেই,
কোনো নামেই আমাকে এখানে ডাকে না কেউ।
কত সাহেব এলেন গেলেন, আমি সেই একই রয়ে গেলাম
বৃদ্ধ গাছেদের মতন [ হাই তুলে ]

আপনি একটু বসুন, আমি এখুনি আসছি।

[ বৃদ্ধ বেরিয়ে যায়। এখনি চিত্রাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। কোমল মুখখানা বয়েসের ছাপকে এড়াতে পারেনি। একরাশ ঘন কালো চুল। চুলগুলো দুহাতে খোঁপার মতো জড়িয়ে নিলো। তারপর অবাক বিস্ময়ে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। এককোণে ডবল-ব্যারেলের রাইফেল, ওভারকোট। বাইরে জ্যোৎস্না, মাদলের সুর ]

বৃদ্ধ : [ প্রবেশ করে ] এত রাত্রে ঘরে আর কিছু নেই
নিন, এইটুকু খেয়ে নিন।

[ চিত্রা প্লেটের দিকে অপলক চোখে তাকায়।
কিছু ফল। এক গ্লাস জল। এক কাপ কফি ]

ভীষণ খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই, এইটুকু খেয়ে নিন।

চিত্রা : [ সসংকোচে খেতে খেতে ] ওখানে কার খাবার ঢাকা ?

বৃদ্ধ : দাদাবাবুর।

চিত্রা : উনি এখনো খাননি ?

বৃদ্ধ : এত মদ খেলে কি কিছু খাওয়া যায় ?

চিত্রা : উনি কি রোজই এমন মদ খান !

বৃদ্ধ : মাঝে মাঝে প্রায়ই খান, ভাত ঢাকা থাকে সারারাত
সকালে উঠে আমাদের শিকারী কুকুর রাজাকে ডেকে ঢেলে দিই।

চিত্রা : উনি কি সারা দিন রাতই এমন মদ খান !

বৃদ্ধ : না, দিনে কখনো খান না,
সারাদিন বন্দুক নিয়ে অরণ্যে অরণ্যে কেবলই ঘুরে বেড়ান
আর রুমাণ্ডি থেকে একটু দূরেই শীর্ণ নদী
কোয়েলের কাছে শিকাব করেন।
ফিরে এসে কখনো কবিতা পড়েন, কখনো সারারাত মদ খান।

চিত্রা : [ জমাট বিস্ময়ে ] তাই নাকি !

[ বিরতি ]

বৃদ্ধ : সাত বছর আগে উনি যখন এখানে প্রথম এলেন
ওসব কিছুই ছুঁতেন না।
দুজনে কত অজস্র গল্প করতাম, আমি বলতাম আদিবাসী

পাহাড়ী ঝরনা আর অরণ্যের কথা, উনি বলতেন
পৃথিবী মানুষের যত বিচিত্র কাহিনী, বলতেন
পরিচিত পৃথিবী থেকে কাকে যেন হারিয়ে এসেছেন অনেক দূরে
[ কি যেন ভেবে ] তারপর
হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে কার যেন চিঠি এলো
আর উনিও কেমন হয়ে গেলেন।

চিত্রা : [ বিস্ময়ে ] কলকাতা থেকে !

বৃদ্ধ : হ্যাঁ, তারপর থেকেই···

চিত্রা : কার চিঠি ?

বৃদ্ধ : তা তো জানি না, কিছুই জানতে পারিনি—
আপনি এখন ওই বিছানায় শুয়ে
রাতটুকু কাটিয়ে দিন, আমি বাইরের বারান্দাতেই আছি।

[ বৃদ্ধ বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা পেছন থেকে বন্ধ করে দিলো। কয়েক মুহূর্তের নিটোল নিস্তব্ধতার পর চিত্রা চারদিকে তাকিয়ে পায়ে পায়ে অঞ্জনের দিকে এগিয়ে গেলো। তার মুখের দিকে ঝুঁকে, কি যেন ভেবে কোলের বইটা তুলে, দু একটা পাতা উলটে, প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো ]

চিত্রা : অঞ্জন, অঞ্জন, আঃ, একি আশ্চর্য !
কতদিন তোমাকে খুঁজেছি অঞ্জন, বিশ্বাস করো, কতদিন
[ আলতো করে কপালের চুলগুলো সরিয়ে ]
'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে' যেন অকস্মাৎ জলে ওঠো, আঃ।

[ এর আগেই গাছেরা নিঃশব্দে প্রবেশ করে, নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে চিত্রাকে ঘিরে ধরেছে। এবং অলক্ষ্য থেকে অন্য আর একটি থমথমে গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে ]

কণ্ঠস্বর : স্থির হও।

চিত্রা : [ প্রায় ছিটকে ] কে।

কণ্ঠস্বর : শান্ত হয়ে অপেক্ষা করো।
এখনো তোমার সময় আসেনি।

চিত্রা : আঃ, অঞ্জন !

গাছেদের কোরাস : ও এখন অপরিচিত এক রঙিন স্বপ্নে মোড়া।

চিত্রা : না না, তা হতে পারে না।
আমার চোখের পাতায় ও যে স্পষ্ট আলোকিত।

কোরাস : ও এখন দিগন্তলীন পৃথিবীর ছায়াপথে
স্বপ্নার্ত মানুষের মতো।

চিত্রা : অঞ্জন '

কণ্ঠস্বর : ও এখন নক্ষত্রলীন নীলিম আকাশে আঁকা
ছোট্ট পাখির মতো।

কোরাস : ও এখন বিশীর্ণ লণ্ঠনের বিকীর্ণ ছায়ার মতো।

চিত্রা : না অঞ্জন, না!

কণ্ঠস্বর : ও এখন স্পন্দিত একটি হৃদয়
নিঃশব্দ স্বপ্নের ভিতর দিয়ে পথ হাঁটে একা।

কোরাস : বাইরে বেদনাহত শান্তি, আর স্বচ্ছ স্রোত
পাল তোলা নৌকার নিঃশব্দ রাত্রি।

কণ্ঠস্বর : তার সাথে নওল মাঝি, ভাটিয়ালি মল্লার
'মন উড়ু উড়ু করা' পদ্মাপারেব সুর

চিত্রা : আঃ, অঞ্জন.
প্রথম প্রতিশ্রুত আমি, সেই দিনই প্রথম ভালো বেসেছিলাম।

কোরাস : আজ 'বিরহ বিলাসে বিপ্রলব্ধ নায়িকা'র মতো

চিত্রা : [ দুহাতে মুখ ঢেকে ] না না না…

কণ্ঠস্বর : চুপ! স্বপ্নের শেষ অন্ধকার কানাগলি
মগ্ন চেতনাচিহ্ন ওকে একাই সবটুকু হাঁটতে হবে।

চিত্রা : আঃ!

কোরাস : তোমার আর্তনাদে সমুদ্র থেকে
দ্রুততর লাফিয়ে উঠে আসবে না স্বচ্ছ বাতাস।
সূর্য তার আপন কেন্দ্রে স্থির।

চিত্রা : [ কান্নার মতো স্বরে ] আমি জানি, আমি জানি

কোরাস : মরুভূমির মতো রিক্ত অরণ্যের অন্ধকারে
মাথা গুঁজে বসে, রয়েছে রাত্রির শুষ্ক বাতাস।

চিত্রা : তবু সেদিন আমরা দুজন দুজনকে
ভাষাহীন নিঃশব্দ ভালো বেসেছিলাম, আর পাশে ছিলো

সন্ধ্যার স্বচ্ছ বাতাস।
এত তীব্র, মনে হয় যেন এইতো
একটু আগেই খেয়া থেকে হাত ধরে নেমেছি দুজনে।

কণ্ঠস্বর : সামুদ্রিক মাছেদের মতো জলের তলায় ছিলো
গলিত নক্ষত্রের আলো।

কোরাস : জলের ওপরে ছিলো হালকা কুয়াশা।

চিত্রা : হ্যাঁ, আশ্চর্য মিষ্টি ঝিরঝিরে একটা ঠাণ্ডা বাতাস।

কণ্ঠস্বর : দাঁড়ের ছন্দ, স্পন্দিত বুকের আওয়াজ
একসাথে মিশে গিয়েছিলো জলের নানান আল্পনায়।

চিত্রা : আর অঞ্জনের হাতটা ছিলো আমার ভীরু হাতেব কোমলতায়।

কোরাস : ওর দুহাত কলঙ্কিত, গভীর রক্তে ভেজা।

চিত্রা : [ অসহ্য যন্ত্রণায় ] না অঞ্জন, না।

কোরাস : ওর দুহাত এখন গভীর রক্তে ভেজা, যেন অতীতের
জমাট অন্ধকার।

চিত্রা : আঃ, আমার রিক্ততা বুঝি
মরা নদী শীর্ণ স্রোত ছিন্ন-বাঁধা পলাতক হাওয়া।

কোরাস : ও খুনী। ও তাকে খুন করেছিলো।

কণ্ঠস্বর : ওর কোনো দোষ ছিলো না।

কোরাস : তবু অন্ধকারে একা ও তাকে খুন করেছিলো।

কণ্ঠস্বর : গাজনের মেলায় স্বল্পমূল্যে কেনা
কোনো পণ্যের মতো রিক্ততার নিঃসঙ্গ সেই নারী,
উচ্ছৃঙ্খল বেহেড মাতালটা
স্বর্ণ মুখোশে ঢাকা সম্রাটের মতো
অসহ্য অত্যাচার করেছিলো, দু উরুর মাঝে
মগ্ন মৈনাকের মতো ভেঙে পড়েছিলো, আব মেয়েটি যেন
ওর হারেমের বন্দী কোনো নগ্ন ক্রীতদাসী।

কোরাস : কানাগলির অজস্র অন্ধকারেও
লোকটার কুৎসিত কুতকুতে চোখের মণিদুটো
আশাতীত লোভে দুর্লভ চুনীর মতো চকচক্ করছিলো !

চিত্রা : এ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না !

কণ্ঠস্বর : আর ও—বিদ্যুৎ বেগে, উজ্জ্বল গর্বিত চোখ
অসহ্য ক্রোধে, পৌরুষ আহত গর্জনে
ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো নগ্ন সম্রাট শয়তানটার ওপর।
কোরাস : তারপরেই ছুরির তীক্ষ্ণ ফলাটা বিঁধে গিয়েছিলো
সমাচ্ছন্ন রক্তের গভীরে।
কণ্ঠস্বর : জীবনে সেই দিনই প্রথম সে শৃঙ্খলিত প্রমিথিয়ুস
কিংবা বন্দী স্পার্টাকাসের মতো প্রতিবাদে
মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিলো,
যেন আত্মলোকের পথে পথে
জলধারার উৎস-চিহ্ন খুঁজে ফেরা কোনো স্মৃতিমুখ।
কোরাস : তারপরেই উচ্ছল নদী থেকে সবার অলক্ষ্যে
পালিয়ে এসেছিলো দূরে—
মগ্ন ছায়া নগ্ন অন্ধকারে নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে।
কণ্ঠস্বর : শিশুরা যেমন অবহেলায় শ্লেটের বুক থেকে
মুছে নেয় খড়ির দাগ, সমুদ্রের উর্মিল ঢেউ যেমন
নির্জন সিক্ত বেলার বুকে পাখিদের পায়ের নানান আল্পনা,
তেমনি করেই অসহ্য ঘৃণায় দুহাত থেকে ও মুছে ফেলেছিলো
মৃত্যু-গন্ধ-জড়ানো সমস্ত রক্তের দাগ।
কোরাস : তাই ও আজ গহন অরণ্যে একা নির্বাসিত।
কণ্ঠস্বর : নিজের বোধের কাছে ও স্বচ্ছ।
কোরাস : ঘরের অজানা অন্ধকারে ও
চ্যুত নক্ষত্রের মতো চির নির্বাপিত।
কণ্ঠস্বর : ভালোবাসার কাছ থেকে দূরে
হৃদয়ের দূরতম প্রান্তে, অনন্ত ঘৃণার অন্ধকারে
তীব্র মশালের মতো ও স্বচ্ছ আলোকিত।
কোরাস : নিজেই নিজের মৃত্যুর গহন অন্ধকারে মোড়া।
চিত্রা : [ চকিতে ] না অঞ্জন, না,
কোনোদিন তা হতে পারে না!
কণ্ঠস্বর : নক্ষত্রখচিত সত্তার অনন্ত আকাশে উদাত্ত
ঘণ্টাধ্বনির মতো ও তরঙ্গিত।

চিত্রা : [ অঞ্জনের চুলে হাত রেখে ] উচ্ছল নদী
রক্তাক্ত স্মৃতির ঢেউ ভেঙে তুমি স্বচ্ছ জেগে ওঠো,
রাত্রির অতল অন্ধকারে আগুনের তীব্র শিখার মতো তুমি
জ্বলে ওঠো অঞ্জন, চেয়ে ছাখো আমি এসেছি।
কণ্ঠস্বর : বাতাস, দেওয়ালের রঙ কি আশ্চর্য উজ্জ্বল হলো
[ মঞ্চের আলো উজ্জ্বল হয়। কোরাস ছিটকে পেছনে সরে আসে ]
যেন শিউলি ঝরানো শরতের সমস্ত আকাশ
নিঙড়ে নিঙড়ে কে আল্পনা দেবে বলে নীরবে হাসছে।
চিত্রা : সে আমার তৃষিত হৃদয়, অনন্ত ভালোবাসা
কোরাস : আজও মানুষ আদিমতম পৃথিবীর
একই অমোঘ অভিজ্ঞতার শরবিদ্ধ পশু, হাতের শিকার।
কণ্ঠস্বর : তোমার সেই হাতের মশাল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ খচিত
দুঃসাহসিক বাণী, বিদ্রোহ, পৌঁছে দাও
সমস্ত গ্রহে, অনন্ত নক্ষত্রলোক পাড়ি দিয়ে।
চিত্রা : দুচোখের সমস্ত দুঃস্বপ্ন মুছে ফ্যালো, চেয়ে ছাখো
জ্যোৎস্নায় কি আশ্চর্য ভিজে যাচ্ছে সারাটা অরণ্যের বুক !
কণ্ঠস্বর : নদীর নিটোল নিস্তব্ধতায় রাখো তোমার তীব্র প্রতিবাদ।
চিত্রা : চেয়ে ছাখো অঞ্জন, মিনতির মতো করুণ
রাত্রির ডানার ভাঁজে ভাঁজে জড়ানো সংগীতের মতো
কোমল ভালোবাসা উজাড় করে রেখেছি তোমার জন্যে
আমার দুহাতের স্তব্ধ করপুটে।
কোরাস : নিয়তির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে পারি না,
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত নয়।
কণ্ঠস্বর : গলিত শব অরাজক ঈশ্বরের চারদিকে
মুমূর্ষু মৃত আর্তনাদ, গৃধিনীর হিংস্র লোভের চোখ নিয়ে
ঝুঁকে রয়েছে অজস্র পাপ।
কোরাস : মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ !
কণ্ঠস্বর : উলঙ্গ মৃত্যুর বিভৎস রঙ দেখে শিউরে উঠুক
পৃথিবী মানুষ নদী।
কোরাস : পৃথিবী মানুষ নিয়তির অন্যহাতে পুতুল পুতুল

কণ্ঠস্বর : [ বজ্র গম্ভীর স্বরে ] অসহ্য ঘৃণায় শ্যাওলা জমা স্থবির পৃথিবীটাকে
টান মেরে আছড়ে ফ্যালো পায়ের নিচে।

[ সহসা সমস্ত কোরাস একসাথে অনৈসর্গিক আর্তনাদে টলতে টলতে বেরিয়ে গেলো। অঞ্জনের ঘুম ভেঙে গেলো, যেন এইমাত্র স্বপ্নে সে চিৎকার করে উঠলো : আমার রাইফেলটা কোথায়, আমার রাইফেল ! বাইরে থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হলো কোরাস : আমার রাইফেল, আমার রাইফেল, আমার রাইফেল, আমার রাইফেল। তার সাথে টেবিল থেকে ছিটকে পড়া মদের বোতল, পেগ ভাঙার ঝনঝন শব্দ। প্রতিধ্বনি অস্পষ্ট হবার আগেই অঞ্জন আবার চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। চিত্রা বিহ্বল ]

কণ্ঠস্বর : ছিঃ অঞ্জন, তুমি না বন্দী প্রমিথিয়ুস…

চিত্রা : অঞ্জন, আমার অঞ্জন !

[ অঞ্জন আগের একই ভঙ্গিতে টেবিলে মাথা রাখলো ]

কণ্ঠস্বর : জীবনের জন্যে তীক্ষ্ণ ঋজু তুমি স্পষ্ট জেগে ওঠো।

চিত্রা : [ মাথাটা বুকে তুলে নিয়ে ] তুমি জেগে ওঠো অঞ্জন।

[ অঞ্জন বিস্ময়ে চিত্রার মুখের দিকে তাকালো ]

কণ্ঠস্বর : জ্যোৎস্নায় কখনো কখনো মায়াকাননে ফুলও
আশ্চর্য আলোকিত হয়ে যেতে পারে।

[ চিত্রার বুকের গভীরে অঞ্জন নিবিড় মুখ ঢাকলো। রবীন্দ্র সংগীতের হালকা সুর : বিরস দিন, বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে ]

চিত্রা : আঃ, তীব্র হরষে রক্তকনিকা আমার
কল্লোলিত হলো, যেন অবক্ষয়ের আঁধারে জন্ম নিলো
গোলাপের ছোট্ট একটা কুঁড়ি !

কণ্ঠস্বর : এতদিনে ওর জন্মের ললিত লগ্ন যেন সার্থক হলো।

চিত্রা : ঠিক যেন অরণ্যের ভাষা হলো ফুল,
কিংবা আকাশের সমস্ত নীল বাগানের সূর্য হয়ে গেলো।

কণ্ঠস্বর : ভালোবাসার রক্তকোরক বাতাসে আন্দোলিত হলো !

চিত্রা : [ অঞ্জনের কপালে চিবুক রেখে ] চেয়ে ছাখো

তোমার জন্যে কি অজস্র রক্তগোলাপের কুঁড়ি
ফুটিয়ে রেখেছি অঙ্গন, ফেনিল সমুদ্র-উজ্জ্বল লাবণ্যের
প্রতিটি কনায় হলুদ পাতার নীড় !

কণ্ঠস্বর : আঃ, অরণ্যনীল সমস্ত নক্ষত্রবীথি, অকস্মাৎ
আলোকিত হলো, যেন স্নিগ্ধ স্বচ্ছ কার হৃদয়
মেলে দিলো অনন্ত হাতে নিবিড় বাতাসের মতো !

এমন সময় বাইরে ভোরের দু একটা পাখি ডেকে উঠলো। বৃদ্ধ ঘুম চোখে দরজা ঠেলে চৌকাঠ পেরুতেই ওদের দুজনকে ওইভাবে দেখে থমকে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে এলো। অন্ধকারের ওপার থেকে শোনা গেলো কণ্ঠস্বর

"পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে
তবুও ফেনার ঝর্ণা, রৌদ্রে প্রদীপ্ত হয়, মানুষের মন
সহসা আকাশ পথে বনহংসী-পাখির বর্ণালি···
নবীন ব্যাপ্তির সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে
শুভ্রতার দিকে অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।"

উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস

## অলক্ষ্য ভূমির দৃশ্য থেকে

বহুদিনের পুরনো ভেঙে পড়া বিশাল একটা বাড়ি। পেছনে সম্পূর্ণ পাতা ঝরে যাওয়া রিক্ত একটা গাছ। বেলা শেষের সূর্য ডুবে গিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে অন্ধকার।

তরুণ : দিন রাত দরজা জানলা—পাহাড় ডিঙিয়ে দূরে
এই বোঝা কাঁধে নিয়ে চলেছি অন্ধকারে
জানি না কবে
লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে।
বৃদ্ধ : চেয়ে দ্যাখো বাড়িটার দিকে।
আমি শুধু তন্ময় হয়ে ভাবি এর যত
অতীত কাহিনী। স্মৃতি বড় ভ্রম হয়
কিছুতেই আসে না স্মরণে।
অথচ আমি যদি না পারি
জীবিত কেউ আর কোনোদিনও পারবে না জানি।
তরুণ : তাহলে এর আগে এই পথে এসেছো নিশ্চয় ?
বৃদ্ধ : জ্যোৎস্নায় ভেসে গ্যাছে সারা পথ
দেওয়ালে মেঘের ছায়া,
সবকিছুই কি আশ্চর্য প্রতীকি মনে হয় ;
চেয়ে দ্যাখো ওই রিক্ত গাছটার দিকে।
তরুণ : ঠিক যেন প্রাচীন বৃদ্ধের মতো ন্যুব্জ নতজানু।
বৃদ্ধ : ঠিক যেন কিছুরই মতো না।
কতদিন দেখেছি ওকে—বজ্রপাতে এমনই রিক্ত, শূন্য।
অথচ বহুদিন, পঞ্চাশ বছরেরও আগে
ওটা ছিলো পত্র পুষ্পে ভরা শুদ্ধ মহীরুহ
যেন সবুজে সবুজে থৈ থৈ সমুদ্র হয়ে গ্যাছে।
কাছে এসো,
এইখানে দাঁড়িয়ে দ্যাখো,

এই বাড়ি, এখানে এখনো কেউ বুঝি আছে!

তরুণ কাঁধের বোঝাটা নামিয়ে রাখে। তারপর এসে দাঁড়ায় প্রবেশ পথের দরজার সামনে।

তরুণ : কই, কোথাও তো কেউ নেই, শুদ্ধ প্রেতপুরী!

বৃদ্ধ : [ম্লান স্বরে] আমি জানি আছে।

তরুণ : দেওয়াল দরজা জানলা উধাও সব,
কোথায় যে ছাদ ছিলো কিছু নেই—
সবটুকু আকাশ আকাশ?
কি যে ছাই কিছুই বুঝি না আমি
দেখে মনে হয় যেন দাঁড়কাকের বাসা।

বৃদ্ধ : একদিন সবই ছিলো
কেউ ছিলো, এই বড় কথা।
আজ আর ভেবে লাভ নেই—কি ছিলো, কি আছে।
তবু অলক্ষ্য ভূমির আত্মারা
এইখানে এসে ভিড় করে, কথা বলে,
এ বাড়ি তাদের কাছে মনে হয় যেন কত পরিচিত।

তরুণ : তুমি কি সাক্ষী তার?

বৃদ্ধ : দেখি ওরা বার বার আসে, কি যেন এক
দুঃসহ যন্ত্রণায় মাথা কুটে হাসে কাঁদে
ফিসফিস করে কথা বলে
সমস্ত বাড়ি যেন জেগে ওঠে আশ্চর্য অনন্য উল্লাসে।

তরুণ : চুপ করো, চুপ করো, শুনতে চাই না আর।

বৃদ্ধ : কাছে এসো
বসো এই ধারে বাঁধানো পাথরে।
এই বাড়ি এখানে জন্মেছি আমি।

তরুণ : এত বড় বাড়ি, এইখানে জন্মেছো তুমি?

বৃদ্ধ : এ ছিলো আমার মার বাড়ি,
তোমারই পিতামহী, অনন্যা রূপসী।
দৃশ্যালী, প্রাঙ্গণ, দেউল—একদিন এ বাড়িতে সবই ছিলো।
আস্তাবলের পাশে শুদ্ধ ওই শিরীষের ছায়ায়

আমার বাবার সঙ্গে যার প্রথম দেখা,
চোখে চোখ রাখা, তারপর পরিণয়।
অথচ যার মা
একটা কথাও বলেননি উনি,
আর কি কঠিন ছিলো ওঁর পণ!

তরুণ : ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো!
পিতামহ একসাথে দুইই পেয়েছিলেন,
অর্থ আর নারী?

বৃদ্ধ : হ্যাঁ, শুধু একবারই চোখে চোখ রেখে
সানাইয়ের সুরে বেজে উঠেছিলো আনন্দ-ভৈরবী।
তারপর ভরা স্মৃতি, সঞ্চয়, যার যা ছিলো সব
সবই গেলো উৎশৃঙ্খল যৌবনের কুটিল আনন্দে।
কিছুই বোঝেননি আগে—কেননা আমার
জন্মের ললিত লগ্নেই তিনি চলে গিয়েছিলেন শুদ্ধতার দেশে।
কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছেন সব।
উন্মত্ত মাতাল, মদ আর নারী, উড়িয়ে ছড়িয়ে নষ্ট করে দিয়ে
বাবা নিজে সমস্ত বাড়িটাকে যেন
গলা টিপে মেরেছেন দু হাতে।

তরুণ : তবু তুমি কি আশ্চর্য সুখী ছিলে!
যখনই মনে হতো
বল্গা ছেঁড়া কেশর ফোলানো দুরন্ত ঘোড়ার
ঝুঁটি ধরে চলে যেতে দূরে।

বৃদ্ধ : নারে বোকা, না। মালিনী আমাকে মানুষ করেছিলো
দুঃখে স্নেহে! আমি যখন ছোট ছিলাম,
ঠিক পনেরো কি ষোলো···বাবা তখন উন্মত্ত মাতাল
নিজে হাতে সারা বাড়ি জ্বেলে দিলেন
দাউ দাউ আগুনের শিখা।

তরুণ : এখন আমার বয়েস কত, ঠিক পনেরো কি ষোলো?

বৃদ্ধ : তারপর সব কিছুই দাবদগ্ধ, পুড়ে গেলো···

তরুণ : এখন আমার বয়েস কত, ঠিক পনেরো কি ষোলো···

বৃদ্ধ : উড়ে গেলো রাশি রাশি ছাই শুধু, সবশেষ।
তরুণ : কিন্তু রাস্তায় ওরা যে সবাই বলাবলি করছিলো—
অন্তিম ঘাতক তুমি,
জলন্ত বাড়িতে তুমিই তাকে খুন করেছিলে ?
বৃদ্ধ : [ চারিদিকে তাকিয়ে ] আগে বলো আশে পাশে
এখানে কি কেউ আছে, তুমি আমি ছাড়া ?
তরুণ : কই, কোথাও তো কেউ নেই, কেউ নেই বাবা !
বৃদ্ধ : [ উজ্জ্বল গর্বিত চোখে ] আমিই তাঁর বুকে
আমূল বসিয়ে দিয়েছি এই ছুরি, গভীর রক্তস্রোতে গাঢ়
এ ছুরি এখনও রয়েছে আমার কাছে।
তারপর তাঁকে ফেলে দিয়েছি আগুনের লেলিহান শিখায়।
রাশি রাশি অগ্নিপিণ্ড শুধু স্তম্ভিত,
গভীর ক্ষতের চিহ্ন পুড়ে সব কালো হয়ে গ্যাছে,
আর আমিও মালির ছিন্ন ভিন্ন নোংরা পোশাকে
পলাতক বালকের মতো শিরীষের স্তব্ধ ছায়া ছেড়ে
চলে গেছি দূরে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি
ফেরি করে এখানে ওখানে, তবু আমি তাঁরই
রক্তস্নাত শিশু, যৌবনের দমকা বাতাসে।
ওই শোনো, কান পেতে শোনো—ঘোড়ার খুরের শব্দ !
তরুণ : কই, কোথাও তো কোনো শব্দ নেই !
বৃদ্ধ : ঘোড়ার খুরের শব্দ—দ্রুত থেকে বুঝি আরও দ্রুততর
হয়ে আসে বাতাসের বেগে।
এ রাত্রি আমার মার বিয়ের রাত্রি
কিংবা আমার ললিত লগ্ন জন্মের সেই কালো রাত্রি।
ঘোড়ার খুরের শব্দ, দেহপসারিণীদের বাড়ি থেকে
বাবা ফিরে এলেন, আকণ্ঠ নেশায় চুর।

*ঠিক এমন সময় সামনের জানলা আলোকে উদ্ভাসিত হলে দেখা গেলো একটি নারীমূর্তি, নিস্পন্দ অপলক।*

জানলায় চেয়ে দ্যাখো, দাঁড়িয়ে শুনছেন উনি।
চেনো না, দ্যাখোনি কোনোদিন—আমার মা

তোমারই পিতামহী, অনন্যা রূপসী।
চাকর-বাকরেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, উনি একা জেগে
এত রাতে ঘোড়ার খুরের শব্দ
ফিরে এলো বারবণিতার উষ্ণ শয্যা হতে উঠে।

তরুণ : কিন্তু ওখানে তো কিছু নেই, শুধু দেওয়ালের
শূন্যতা ছাড়া? ও তোমার কল্পনা,
দিন দিন পাগলামো বেড়ে ওঠে বুঝি।

বৃদ্ধ : কান পেতে শোনো, ঘোড়ার খুরের শব্দ দ্রুত থেকে
আরও দ্রুত, দ্রুততর বাতাসের বেগে
কবরের শূন্য প্রান্তর থেকে বাড়ির পেছনে
আস্তাবলের কাছে এসে থেমে গেলো,
বেঁধে দিলেন ফেনা ওঠা ক্লান্ত ঘোড়াটাকে শিরীষের ডালে।
মা নিচে নেমে এসে দরজায় দাঁড়ালেন,
আজ রাতে উনিও কিছু কম যান না তাঁর চেয়ে।
বাবা অর্ধ উন্মত্ত, মা সম্পূর্ণ পাগল
তাঁকে কাছে পাবে বলে।
দুজনেই ক্লান্ত, সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে এলেন ওপরে
মার নিভৃত কক্ষে, এইখানেই বিবাহ বাসর।
বেশ মনে পড়ে জানলায় অস্পষ্ট আলোক উদ্ভাস।
অন্ধ, অন্ধ দুজনেই, যেন সঙ্গম উন্মত্ত পশু।
যদি কোনো শব্দ হয়, কিছুই শুনতে পাবেন না ওঁরা
এমনই স্তব্ধ সমাহিত—এইসব দেখেছি আমি।
যদিও জানি দৈনন্দিন যথাযথ সবকিছুরই মধ্যে বাঁচবেন উনি,
তবু যৌবন,
কামনার সবকটি দীপ জ্বেলে
নিজেকে আত্মাহুতি দেবে বলে কাছাকাছি ঘোরে,
অথচ জীবনে কোথাও অনাবিল আনন্দ নেই
দুঃখ যেন আলোহীন অনড় অন্ধকার।

এমন সময় জানলার আলো ম্লান হয়ে গেলো। তরুণ চকিতে উঠে দাঁড়ালো।

একি! উঠলে কেন? তুমি কি এখনই ফিরে যেতে চাও?

শোনো, আমার অর্থের যাকিছু সঞ্চয়
এখনও রয়েছে তোমার হাতে, কোনোদিন চাইনি হিসেব।

তরুণ : আমাকে কোনোদিন কিছুই দাওনি তুমি
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অর্থের ন্যায্য অধিকার।

বৃদ্ধ : আমি তো সবই দিয়েছি। এখনও তরুণ তুমি
উড়িয়ে ছড়িয়ে নষ্ট করে দেবে।

তরুণ : তাই যদি করি, কিছু কি এসে যায় তাতে ?
আমারও সম্পূর্ণ অধিকার আছে
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শিরায় শিরায় যত রক্তের ঋণ।

বৃদ্ধ : বেশ, তবে আর কোনো কথা নয়, ব্যাগটা আমাকে দাও।

তরুণ : না।

বৃদ্ধ : তাহলে মনে রেখো আমিও ছেড়ে দেবো না।

তারা ব্যাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করার সময় হঠাৎ পড়ে গেলো। ঝনঝন শব্দে স্বর্ণমুদ্রাগুলো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় বৃদ্ধ টলতে লাগলো, কিন্তু একেবারে পড়ে গেলো না। ওরা পরস্পরের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলো। এমন সময় জানলা আবার আলোকে উদ্ভাসিত হলো। পুরুষমূর্তি পেয়ালায় মদ ঢালছে।

তরুণ : আমার পিতামহের অন্তিম ঘাতক তুমি,
এখন দুহাতে গলা টিপে তোমাকে খুন করি যদি ?
কেননা সেদিন তুমি ছিলে তরুণ, এখন বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ : [ জানলার দিকে তাকিয়ে ] চেয়ে দ্যাখো,
সেদিনের সেই তরুণ যুবক…

তরুণ : [ বিস্ময়ে ] কি বলছো তুমি ?

বৃদ্ধ : এখনও কি উচ্ছল উদ্দাম যৌবন,
অথচ মা জানতেন উনি ভালোবাসেন না তাঁকে।

তরুণ : কি বলছো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

বৃদ্ধ জানলার দিকে ইশারা করলো।

একি, জানলা আবার আলোকে উদ্ভাসিত হলো,
আঃ, অস্পষ্ট ছায়া কে যেন দাঁড়িয়ে ওখানে !

বৃদ্ধ : জানলা আবার আলোকে উদ্ভাসিত হলো
কেননা আমার বাবা, তোমার পিতামহ

এখনই মদিরার ফেনিল স্রোতে স্তব্ধ হয়ে যারেম বনে
ক্লান্ত পশুর মতো জানলায় হেলান দিয়ে আছেন।

তরুণ : বহুদিন আগের মৃতদেহ এখনও স্পষ্ট এতো !

বৃদ্ধ : 'তখনই নববধূর নিদ্রা গেলো ঘুচে আদমের চাপে'
লাইনটা কোথায় পড়েছিলাম যেন।

তবু জানলায়
এখন আর কিছুই আনত নয়
যার মনে স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া। মৃত্যুর দিনে উনিই ছিলেন
সবচেয়ে নিঃসঙ্গ, দুঃখের সমুদ্রে যেন একা।

তরুণ : আমারও জন্মের আগে যা ছিলো স্তূপাকার হাড়
এখনও স্পষ্ট এত, উঃ, কি বীভৎস ভয়ংকর !

তরুণ চোখ বন্ধ করলো।

বৃদ্ধ : অথচ পশুটা কিছুই জানলো না, জানতে পারেনি।
আমি যদি এই জানলার নিচে কাউকে খুন করি,
তবু তার এতটুকু ঢেউ কোথাও জাগবে না, কিংবা স্পন্দন···

হঠাৎ তরুণ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলো।

একই ছুরিতে পিতা পুত্র, আঃ, সব সব শেষ !

বৃদ্ধ আবার ছুরি বসালো। অন্ধকার হয়ে গেলো জানলা।

আঃ, বিদায় পুত্র আমার, বিদায়,
'তোমার বাবা উৎশৃঙ্খল মাতাল, মা অনন্য রূপসী'
কবে কোথায় যেন পড়েছিলাম। আর এখন
আমি যদি গান গাই, সে হবে আমার মায়েরই অনন্য কণ্ঠস্বর,
আশ্চর্য যন্ত্রণায় ভরা।

এমন সময় সমস্ত মঞ্চ জুড়ে নেমে আসবে অন্ধকার। শুধু যেখানে
গাছটা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে উজ্জ্বল স্পষ্ট আলো।

গাছটার দিকে চেয়ে ছাখো
হিমেল জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট আলোকিত,
যেন নিদ্রালসা তপতীর শান্ত মুখশ্রী। আঃ, মা আমার,
জানলাটা আবার অন্ধকার হয়ে গেলো,
তবু জানি তুমি এখনও উজ্জ্বল আলোকে। কেননা

দুহাতে সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা ছিন্ন করেছি আমি,
হত্যা করেছি সেই শিশুকে যে একদিন বড় হবে,
তারপর ফেনিল রক্তের স্রোত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া
নারীর কামনা আশা, দুঃখ সুখ, ভালোবাসা
দুপায়ে মাড়িয়ে দমকা বাতাসের মতো চলে যাবে দূরে।
আঃ, আজ আমি ছিন্নভিন্ন, রিক্ত অতীত।
তবু সান্ত্বনা—কোনোদিন, আর কোনো নারী
কারো কোনো ক্ষতি হবে নাকো জানি।
এই ছুরি যখনই আমূল বিদ্ধ করেছি আমি
গভীর রক্তে ছিলো অন্ধকার,
তারপর বাইরের বাতাসে আবার উজ্জ্বল আলোকিত!
[ ছুরি মুছে, মুদ্রাগুলো কুড়তে কুড়তে ] এখন চলে যাবো দূরে
বহুদূরে, অন্যকোথা—বলবো পুরনো গল্প,
অতীত কাহিনী যত, রক্তঋণ, অনাগত মানুষের কাছে।
[ চকিতে মুখ তুলে ] আঃ, আবার ঘোড়ার খুরের শব্দ!
এত দ্রুত ফিরে এলো কেন?

বিরতি

পরপর দুটো খুন, অকারণে,
তবু এ রাত্রি বারবার স্পন্দিত হবে জানি।
এত স্বপ্ন যার মনে ভেসে যায়, দুকূল প্লাবিত বুঝি!
হে ঈশ্বর,
তাঁর আত্মা শান্তি পাক,
পৃথিবী মুক্তি দিক স্পন্দিত মানুষের গভীর দুঃখ যত,
আঃ, দুঃসহ যন্ত্রণার করুণ বিলাপ! মৃতেরা
মুক্তি পাক, তৃপ্তি পাক কবরের মুঠো মুঠো নীলিম শান্তি।

সারা মঞ্চ জুড়ে নেমে আসবে অন্ধকার।

— —

অনুবাদ / অসিত সরকার

## পল ভালেরি
## সেমিরামিস

প্রথম অঙ্ক : রথ। বিশাল একটা হলঘর। কারুকার্য করা একটা বিরাট দরজা। বাঁদিকে বীভৎস, প্রাচীন রীতিতে দারসেটোর প্রকাণ্ড একটা প্রতিমূর্তি। মুখটা নারীর মতো দেহটা মাছের। ডানদিকে মূর্তির মুখোমুখি সিংহাসন, তার ওপর এক ঝাঁক স্বর্ণখচিত পারাবত। মূর্তির পাশে প্রজ্বলিত দীর্ঘ প্রদীপ। সিংহাসনের চারদিকে আলোকসজ্জা। সময়ে জ্বালানো হবে।
পর্দা উঠলে দৃশ্যটা মনে হবে শান্ত বিষণ্ণ। মৃদু স্বরমূর্চ্ছনা কিংবা একেবারেই না। প্রাসাদের কয়েকজন দাসদাসী কর্মব্যস্ত। কয়েক মুহূর্তের এই দৃশ্যটা নৃত্য ছন্দময়তার মধ্যে দিয়ে অভিনীত হবে।

বন্দীদের প্রবেশ

বাইরে চিৎকার। প্রহরীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সামরিক আদেশ। তীব্র শিঙাধ্বনি আর তূর্যনিনাদ। দারুণ এই হৈ-হট্টোগোলের মধ্যেও মঞ্চের সবাই স্থির। ভীষণ শব্দে দরজাটা খুলে গেলো। সৈন্যবিতাড়িত শৃঙ্খলিত বন্দীদের দর্শকের দিকে মুখ করে নতজানু হয়ে বসতে বাধ্য করানো হলো। তুমুল রলোরোলে হারিয়ে গেলো পায়ের ছন্দ। তারপর এক শঙ্কিত উৎকণ্ঠায় নিস্তব্ধতা।

সেমিরামিস প্রবেশ করলেন

আবহ সংগীতে ব্যঞ্জনাময় রাজকীয় ঔদ্ধত্য। শত্রুমুণ্ডে সুসজ্জিত একটা হালকা রথে রাণীর আবির্ভাব। স্বর্ণশৃঙ্খলে আটজন বন্দী রাজা রথ টানছে।
রাণীর দেহে সর্বাঙ্গ আঁশে ভরা কালো পোশাক। হাতে সোনার ঢাল, কাঁধে ডানা মেলা স্বর্ণখচিত পারাবত। হাতির দাঁতের কারুকার্য করা শিরস্ত্রাণে মুখের নিম্নাংশ ঢাকা। পিঠে মৎস্যাকৃতি তূণ। একহাতে চাবুক, অন্যহাতে ধনুক।
রাণীর রথ মঞ্চের কেন্দ্রে পৌছলে নেমে এলো নিটোল নিস্তব্ধতা।
পরাজিত রাজাদের সমবেত সংগীত :

হায় হতভাগ্য, একি যন্ত্রণা আবার
লজ্জা, হায় অক্ষম ঈশ্বর !
মিছেই দ্রষ্টার কণ্ঠস্বর,
বৃথা বুঝি প্রাণ যায় মৃত্যু পারাবার…

প্রথম ঘটনা : সৈন্যরা জোর করে রাজাদের সিংহাসনের নিচে এবং অন্তদের মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে দিলো, যেন সারা মঞ্চ জুড়ে বিছোনো হলো একটা গালচে। সৈন্যরা নতজানু এবং দাসীরা নিজেদের শায়িত করলো সিংহাসনের দুপাশে।

দ্বিতীয় ঘটনা : রথ থেকে নেমে রাণী ত্রস্ত পায়ে বন্দীদের মাড়িয়ে সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তৃতীয় ঘটনা : রাণীর প্রসাধন। পরিচারিকাদের গুণগুণ স্বর। পরিচারিকারা রাণীর রণসজ্জা খুলে পরিয়ে দিচ্ছে রাজকীয় সাজপোশাক। সিংহাসন উজ্জ্বল আলোকিত। সিংহাসনের সমান্তরাল সিঁড়িতে দাসীরা সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে, হাতে প্রসাধন সামগ্রী। এগিয়ে দিচ্ছে দর্পণ, মুকুট ইত্যাদি। মৃদু সুরমূর্চ্ছনার সাহায্যেই মঞ্চের এই দৃশ্যকে ছন্দময় করে তুলতে হবে।

প্রসাধন শেষে সেমিরামিস কুনুইয়ে ভর দিয়ে এক পাশে হেললেন। হাতে রাজদণ্ড।

চতুর্থ ঘটনা : পুরোহিত এবং সৈনিকদের নৃত্য। ক্রীতদাসেরা বয়ে নিয়ে এলো বিজিত দেবমূর্তিগুলি : নানা ধরণের বীভৎস মূর্তি, কারো মাথা পশুর মতো, অধিকাংশই অবয়বহীন। দারসেটোর মূর্তির সামনে ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেলা হলো। অর্কেষ্ট্রায় বিভিন্ন সুর। রাণীর ইঙ্গিতে মূর্তিগুলো হাতুড়ি ও বর্শার সাহায্যে ভেঙে ফেলা হলো।

একসঙ্গে শোনা গেলো দুটি বিপরীত কোরাস।

পঞ্চম ঘটনা : রাণী এবং একজন বন্দী। নারকীয় এই শব্দে একজন বন্দী মাথা তুলে ক্রুদ্ধ ভীত চোখে তাকালো। রাণী ওকে দেখলেন এবং রাজদণ্ড হাতে দ্রুত নেমে এলেন ওর দিকে। আঘাতের মুহূর্তে বন্দী অপলক চোখে তাকালো রাণীর দিকে, তারপর দুহাতে মুখ ঢাকালো। নিশ্চল রাজদণ্ড। ওর রূপলাবণ্যে রাণী থমকে দাঁড়ালেন, চুলের মুঠি ধরে মাথাটা তুলে দীর্ঘক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর চুলের মুঠি ধরেই ওকে নতজানু করে দিলেন। প্রহরীরা ছুটে এলো ওকে হত্যা করতে। চোখের ইঙ্গিতে রাণী তাদের সরিয়ে দিলেন। তাদের হাতে তুলে দিলেন রাজদণ্ড। তারা নতজানু হয়ে রাজদণ্ড চুম্বন করলো, কপালে ঠেকালো ইত্যাদি···

সেমিরামিস ওকে চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন, টেনে নিয়ে এলেন মঞ্চের সামনে। সেখানে ও নির্বোধ নিশ্চলের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

এখন উনি ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন, লোকে যেমন নীলামে ঘোড়া কেনে। উনি স্পর্শ করলেন ওর কাঁধ, বাহু ইত্যাদি। ওঁর ঠোঁটে ফুটে উঠলো পরিতৃপ্তির এক অদ্ভুত হাসি। উনি খুলে দিলেন বন্দীর শৃঙ্খল। বন্দী তার বাহুতে হাত বোলালো, বাহুদুটি জড়িয়ে রাখলো বুকের ওপর।

আলো এখন ম্লান। অন্ধকারে মঞ্চের কোথায় কি হচ্ছে স্পষ্ট বোঝা যাবে না। পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোগুলো এক সঙ্গে জ্বলে উঠলো।

রাণী ধীরে ধীরে বন্দীর পায়ের নিচে লুটিয়ে পডলেন, জানুদুটো জড়িয়ে ধরলেন, প্রণয়াকুল তাকিয়ে রইলেন বন্দী মুখের দিকে।

বন্দী ফিরে পেলো তার প্রত্যয়। মৃদু চুম্বন করলো রাণীর কুন্তল, এবং এইভাবে কিছুক্ষণ পর ওর মুখে ছড়িয়ে পড়লো এক নিঃশব্দ হাসি। ধীরে ধীরে নেমে এলো যবনিকা।

প্রথম গর্ভাঙ্ক : প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যের যবনিকা ওড়নাব মতো হালকা এবং ঢেউ খেলানো, তাতে সুতোর কাজ করা বিশাল একটা পাখির ছবি। দর্শকের বাঁদিক থেকে আগাগোড়া সমগ্র পর্দাটি তিন চতুর্থাংশ খণ্ডিত, যাতে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

বাঁদিকে মঞ্চের সামনে, অস্ত্রে সুসজ্জিত নারী প্রহরী। ডানদিক থেকে বন্দী রাজাকে চকিতে ঠেলে দেওয়া হলো ওদের সামনে। পেছনে খাবারের থালা, ফল, সুগন্ধি ধুনচি হাতে পরিচারিকারা। অলক্ষ্যে ভাঁড়েদের প্রবেশ। বিচ্ছিন্নভাবে পর্দার ওপারে কি হচ্ছে দেখার প্রচণ্ড কৌতুহল, শেষে কামোদ্দীপ্ত নৃত্য।

ক্রমশ পর্দা কাঁপবে, যেন বাতাসে দুলছে। বাঁদিক থেকে পর্দা গুটোবে, ডান দিকের অংশ থাকবে নিশ্চল এবং অর্ধেক ওঠার পর অভিনয় শুরু হবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক : শয্যা। মঞ্চের পেছনে এবং দুপাশে কারুকার্য করা পর্দা, যাতে মনে হবে ওটা একটা ঝুলন্ত বাগান। সারা মঞ্চ জুড়ে একটা শয্যা, বাঁদিক থেকে পিরামিডের মতো ঢালু। এখন রাত্রি। মাথার সামনে সুন্দর একটা দীপাধার, সুগন্ধি ধূপদান। বিশাল রেকাবে খাদ্য, ফল। প্রায় শয্যা ছুঁয়ে ঝুলছে কারুকার্য করা স্বর্ণশৃঙ্খল।

মধুযামিনী। পোশাক হিসেবে সেমিরামিস কেবল রত্নালঙ্কারে সজ্জিত, বন্দী আরক্ত হালকা পোশাকে। দীর্ঘক্ষণ ওরা আলিঙ্গনাবদ্ধভাবে শুয়ে থাকে।

সমবেত : নিষ্ঠুর কপোতী, হায়, সেমিরামিস !
নিজেকে দ্যাখো, কামনায় কি মুমূর্ষু অন্তিম !
লুণ্ঠিতের চুম্বনে তোমার কোমল শরীর,
তোমার হৃদয় অর্পিত আহা মুগ্ধ পুলকে।
একাকিনী : রাত্রির গভীরে এই আমি
রাণী নই, নেই কোনো রাজসিংহাসন,
রাত্রির স্তব্ধতায় আমি শুধু আমি !
রাত্রির গভীরে এই আমি,
আমার মুখ মেশা তোমার মুখে
রাত্রির গভীরে স্পন্দিত একটি শরীর,
শুধু নিঃশ্বাসে স্পন্দিত একটি শবীর !
রাণী নই, নেই কোনো রাজসিংহাসন,
রাত্রিব গভীরে এ আনন্দ কেবল একান্ত আপন !

প্রথম ঘটনা : বন্দী উঠে রাণীর কাছ থেকে পালাবার ছল করলো। বালিশের ওপর হাঁটু রেখে রাণী ওকে অনুসরণ করলেন।

বন্দী আবার শুয়ে ঘুমোবার ভাণ করলো। রাণী কামনাবিহ্বল চোখে ওর দিকে তাকালেন, চুম্বন করলেন চোখের পাতা। ছলনা আর উন্মত্ত আলিঙ্গনে বন্দী জেগে উঠলো।

দ্বিতীয় ঘটনা : রাণী রেকাব থেকে নির্যাসের শিশি নিয়ে ওকে প্রায় ভিজিয়ে দিলেন। তারপর কিছু ফল, একটা পেয়ালা তুলে শিশুর মতো খাওয়ালেন, যেন উনি ওর ক্রীতদাসী। চুম্বন করলেন ওর বাহু, পায়ের পাতা, বিনীত ভঙ্গিতে আত্মসমর্পনের ব্যাকুলতা।

তৃতীয় ঘটনা : বন্দী ওর দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকালো, প্রভুত্বের ভঙ্গিতে অনাবিল বিজয়ীর সব ঔদ্ধত্যই পরিস্ফুট, রাণী যেন তারই ব্যবহার্য কোনো বস্তু, পারিপার্শ্বিকতায় যা প্রথম অঙ্কের ঠিক বিপরীত দুহাতে রাণীর মাথাটা মুখের সামনে তুলে বর্বরের মতো হাসলো। রাণী ওকে প্রত্যাখান করলেন। বন্দী আবার রাণীকে ওর পায়ের কাছে জোর করে শুইয়ে দিলো। উনি ওঠার চেষ্টা করলেন। বন্দী ওঁর গায়ে হাত তুললো।

চকিতে সেমিরামিসের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো। পালটে গেলো মুখের রেখা, চোখের পাতায় ছেয়ে আসা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। বন্ধ করলেন

চোখ, নিজেকে গুটিয়ে নিলেন—যেন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া কোনো পশু।

বন্দীর মুখে অবজ্ঞার হাসি, তারপর অট্টহাস্য।

দীপাধারের স্বর্ণিল আলো এখন রক্তবর্ণ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বন্দী নিষ্ঠুর হাতে রাণীকে ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করলো। নিজেকে মুক্ত করে রাণী দীপ্ত সর্পিনীর মতো মাথা তুললেন। ফিরে এলো ওর যোদ্ধার সহজাত ভঙ্গি। প্রচণ্ড হিংস্রতায় উনি ওকে ঠেলে দিলেন, অট্টহাসিতে বন্দী গড়িয়ে পড়লো শয্যার প্রান্তে, যেন খুব মজার একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।

রাণী চিৎকার করলেন, ঘণ্টায় ঘা দিলেন। শোনা গেলো ক্রুদ্ধ গর্জন। মঞ্চের চারপাশ থেকে প্রাসাদরক্ষীরা বেরিয়ে এলো। ঝাঁপিয়ে পড়লো বন্দীর ওপর, জালে জড়ালো কিংবা ওর গলায় পরিয়ে দিলো একটা ফাঁস। রক্ষীদের যাওয়া আসা ধস্তাধস্তি কিছুক্ষণ ধরে চলবে, কেননা বন্দী জীবন পণ করে লড়ছিলো।

চতুর্থ ঘটনা: এই ধস্তাধস্তির মধ্যেই রাণী দ্রুত একটা কালো নরম পোশাক জড়িয়ে নিলেন। তুলে নিলেন বর্শা। নিশানা করলেন বন্দীর দিকে, তারপর ছুঁড়লেন, লাফিয়ে নামলেন বিছানা থেকে। মঞ্চ এখন অন্ধকার। তারপর আলো জ্বললে দেখা গেলো পর্দা পড়ছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক: পর্দার সামনে ডানদিক থেকে নারীরক্ষীবাহিনীকে প্রবেশ করতে দেখা গেলো। হিংস্র উল্লাসে ওরা বন্দীর দেহটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁদিকে ওরা মিলিয়ে গেলো। মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধতা। ম্লান হয়ে এলো আলো। তারপর পর্দার ফাঁক দিয়ে সেমিরামিস বেরিয়ে এলেন দর্শকদের দিকে। হাতে জ্বলন্ত একটা প্রদীপ।

এই মুহূর্তে বাঁদিকের পর্দা অর্ধেকটা উঠে গেলো। দেখা গেলো ঘোরানো সিঁড়ির প্রথম কয়েকটা ধাপ।

শান্ত ধীর পায়ে রাণী সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলেন। আবার নেমে এলো যবনিকা।

তৃতীয় অঙ্ক: মিনার। নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান এবং স্তবের জন্যে মিনারের উচ্চতায় মঞ্চটি সুসজ্জিত। কম্পাসের চারটি কাঁটায় চিহ্নিত চারটি বিশাল দৈত্যমূর্তি—সেদ, মানুষের মুখাকৃতি একটি বৃষ; নেরগাল, মানুষের মুখাকৃতি একটি সিংহ, ওস্তর, মানুষ; নেতিগ, মাথাটা যার ঈগলের মতো। ওপরের মঞ্চে দীর্ঘ একটা

পাথরের বেদী। নিশান্তিকা। আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা। দর্শকের দিকটাকে পূর্বদিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। পরে ভোরের আলোয়, পেছনে, সারাটা দেশের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যাবে—অরণ্য, নদী, শহর আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

বহুরূপীর বিভিন্ন পোশাকে চারজন জ্যোতিষী, সমবেত কণ্ঠে স্তবগান করছে।

আদার···নেরগান···বেলিট···নেবো···মার্দুক···ইস্তার···

প্রথম জ্যোতিষী : বেল-এর আত্মা জগতের সম্রাট···

সবাই : আমাদের স্মরণ রেখো।

দ্বিতীয় জ্যোতিষী : সীন-এর আত্মা, জগতের অধিষ্ঠাত্রী···

সবাই : আমাদের স্মরণ রেখো।

তৃতীয় জ্যোতিষী : ইস্তার-এর আত্মা, যোদ্ধাদের ঈশ্বরী···

সবাই : আমাদের স্মরণ রেখো।

চতুর্থ জ্যোতিষী : নিশান্তিকায় ফিরে এলো ঈগল,
ভালোবাসার রক্তে স্নাত পাবারত মেলে দিয়েছে
তার ত্রস্ত ডানা
জীবনের উচ্ছল পেয়ালা এখন রিক্ত শূন্য :
মৃত্যুর পায়ে উৎসর্গিত তার ভালোবাসা।

সবাই : সেমিরামিস, ঈশ্বরী,
সেমিরামিস, অতুল ঐশ্বর্যময়ী !
ঈশ্বরের শক্তি উৎসারিত, স্বর্গের পারিজাত,

আভূমি নত হয়ে ওরা বিড় বিড় করলো।

*মিনারের নিচের থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে সেমিরামিস উঠে এলেন।* দীর্ঘ নরম কালো পোশাকে জড়ানো সর্বাঙ্গ, আকাশকে গভীর প্রণতি জানালেন। তারপর খুব ধীরে ধীরে, যেন 'নাক্ষত্রিক নৃত্য'-এর ভঙ্গিতে ফিরলেন।

সেমিরামিস : উত্তুঙ্গ, আমার এই সীমাহীন আকাশ,
যা আমি গড়েছি নিজে,
উত্তুঙ্গ এই মিনার আমারই সৃষ্টি, একান্ত আপন।
প্রজাতির রক্তে স্নাত এ সাম্রাজ্যের যত পুষ্পিত কানন···
স্বর্গের দেবালয়, আমি গাই তোমার স্তবগান।
তোমার উত্তুঙ্গ চূড়ায় ওড়ে শ্বেতপারাবত।
তোমারই অসীমে, নক্ষত্রমালায় আমি উন্মত্ত মাতাল।

রাত্রিদিন বহমান অনিন্দ্য স্বচ্ছতায় আমি স্নাত—
দিগন্তের অনুপম হিমে মন যেন ক্ষিপ্ত অসিধারা,
হৃদয়ে জন্ম নিলো ভালোবাসা, তারপর
উচ্ছল আনন্দে মুক্ত অনাবিল, ক্লান্তিহীন! নেই কোনো
উষ্ণ কোমলতা কিংবা গোলাপ, কেবল তিক্ত স্মৃতি!
আঃ, বুঝি তাও নয়, কেবল শক্তির বৃথাই দম্ভ!
তোমায় প্রণতি, আমার আপন আকাশ, কালের এই মন্দির
যেখানে আমি আবার এসেছি
ঈশ্বরের সঞ্চিত সুধা পান করে অনন্যা হবো বলে।
আমি শুদ্ধ, পবিত্র—ভালোবাসায়
অন্য নারীর মতো আর কখনও হবো না নগ্ন ক্রীতদাসী—
বিদেশী শত্রুর কত বেদী আমি বিধ্বস্ত করেছি, পঙ্কিল করেছি দেবালয়।
আমারই আদেশে ওদের দেবতারা ছিন্নভিন্ন
প্রকম্পিত রাজারা পদদলিত পায়ের নিচে।
বর্বর মানুষের রক্ত মাড়িয়ে আমি হেঁটে গেছি নিজে।
এখন জেগে উঠছে ঘুমন্ত শহর, মানুষের আস্তাবল, পশুর খোঁয়াড়,
যেখানে মানুষ জন্মের প্রয়োজনে জন্মায়, মৃত্যুর প্রয়োজনে মরে,
নিজেকে শুধাই, জানি না
সত্যিই যা অনুভব করি, আমি কি জীবনের ভয়ে ভীত
না মৃত্যুর?
কিন্তু,···নক্ষত্রপুঞ্জের চোখে ওরা তো একই, অবিচ্ছিন্ন···

সবাই: নক্ষত্রপুঞ্জের চোখে ওরা একই, অবিচ্ছিন্ন।

সেমিরামিস: আমার অর্জিত জ্ঞান, আমার বাহুবল
আমার রণকৌশল, আমার সাহস, আমার নিষ্ঠায়
আমার রমণীয় লাবণ্যে, আমার চোখের ছায়ায়
আমি অর্জন করেছি ক্ষমতার দুর্গম রহস্য,
গ্রহণ করেছি মানুষের সৌন্দর্যের এককণা,
এবং সঞ্চয় করে রেখেছি তাকে
এ পৃথিবীর ক্লেদাক্ত নীচতা থেকে দূরে আমার হৃদয়ে!
আহা, এই অসীমে স্বর্ণাভের দেখে আমার যে কি ভীষণ ভালো লাগে!

সবাই : যোদ্ধার অধিষ্ঠাত্রী, ইস্তার আপনার সহায় হন !
সেমিরামিস : ভালোবাসা নিজেই পদানত আমার পরাক্রান্ত দুটি বাহুতে,
আমি পরাজিত করেছি তাকে।
একজন জ্যোতিষী : সৌন্দর্য্য কি অস্ত্র তুলে দেয়নি তার হাতে ?
সেমিরামিস : যাকে খুশি বিদ্ধ করি আমি। ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ পুলকে
লুব্ধ শরীর অমিত উচ্ছলতা বুঝি মৃত্যুরই মতন…
আনন্দ আমার যেন ক্ষুধিত সিংহ :
সুগন্ধি শয্যায় আমি আনি রাজকীয় শিকারের উন্মত্ত উত্তাপ।
একজন জ্যোতিষী : অনন্যা সেমিরামিস !
সেমিরামিস : কামনাউন্মত্ত প্রেমিক নিজেকে ভাবলো প্রভু
অথচ সেমিরামিস
ওর চেয়ে অনেক অনেক বেশি পৌরুষদীপ্ত
শান্ত পাবারত ওকে তুলে নিলো শকুনের শিকারী ঠোঁটে…
একজন জ্যোতিষী : পবিত্র সেমিরামিস !
সবাই : উনি তাকে হত্যা করেছেন।
একজন জ্যোতিষী : মহান সেমিরামিস !
সবাই : উনি তাকে হত্যা করেছেন।
সেমিরামিস : সবাইকেই দিয়েছি তার যোগ্য আতিথ্য :
আমার রাত্রি পেয়েছে শরীরের স্বাদ,
শরীর তার ভালোবাসা,
ভালোবাসা তার মৃত্যুকে।
সবাই : সত্যিই সেমিরামিস…
সেমিরামিস : [ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে ] চুপ করো !
পালাও মিথ্যুকের দল, পালাও! ভয় করো না
আমার কঠিন দৃষ্টিকে, তোমরা কি ভাবো
আমি নিজে ছাড়া কেউ দিতে পারে আমার যোগ্য
সম্মান ?

জ্যোতিষীরা সবাই একসঙ্গে পেছিয়ে আসে

মিথ্যেবাদী, চাটুকার ! আমার গৌরব আমি নিজে,
তোমরা কি জানো তার…

পালাও পালাও, নইলে মরবে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে !
তোমরা যেমন পড়ো সেমিরামিস কিংবা তাহাদের ভাষা
তার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট, অনেক স্বচ্ছ
সেমিরামিস পড়তে পারে তোমাদের মনের ভাষা।

ভীত আর্তকণ্ঠে জ্যোতিষীরা পালালো। এখন সবকিছুই আলোয় আরক্ত। একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে দূরের যাবতীয় দৃশ্যালী।

সেমিরামিস : [ শান্ত, অবজ্ঞার স্বরে ] এইসব ভীরু দার্শনিক
নির্বোধের মতো স্মরণ করিয়ে দিলো
ওরা আমারই অন্নে লালিত…
আমার অনন্য বন্দী, ও ছিলো সত্যিই আন্তরিক।
এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কি হতে পারে—পৌরুষদীপ্ত কেউ
যাকে আমি প্রলুব্ধ করবো, আর সে নিজে
মুগ্ধ হয়ে নারী ছাড়া আর কিছু নয় এমন কোনো রাণীর
বিনীত দেহদানে ?
সত্যিই ও ছিলো অনিন্দ্য সুন্দর।
এবং ওরই জন্যে আমি অনাবিল উচ্ছলতায় নেচেছিলাম,
ঠিক এই রকম…

কামোন্মত্ত নাচের একটি ছন্দ রূপ পেলো পায়ের পাতায়।

ওরই জন্যে আমি কি আশ্চর্য নেচেছিলাম ! শুধু ওর জন্যে ?
না, প্রথমে আমারই জন্যে।

উনি মিনার প্রাচীরে গিয়ে বসলেন। দূর থেকে শোনা গেলো মিষ্টি একটা গানের সুর। রাণীর চোখে ফুটে উঠলো বিষণ্ণ একটি স্বপ্ন—চকিতে উঠে উনি আবার কামোদ্দীপ্ত নাচটা নাচলেন। তারপর সহসা থেমে :

"সেমিরামিস পবিত্র, কেননা উনি হত্যা করেছেন তাকে"
আঃ, সত্যিই আমি নিজে, নিজে সেমিরামিস।
ওই যে রাখাল গান গাইছে নিচে
ভালোবাসার কোন্ উচ্ছলতায় আমি জানি না,
ও কি টলাতে পারবে রাণীকে ?
ভোরের বাতাসে ছড়ানো এই যে করুণ বিষণ্ণতা
ও কি আমাকে ছোট করে দিতে পারবে এ পৃথিবীর দুঃখের কাছে ?

না সেমিরামিস, অনন্ত আমার এই নিঃসঙ্গতা !
জীবনের জন্যে আমি অনুপম, আমার আর অন্য কোনো
কামনা নেই, না মৃত্যুর জন্যেও !

অস্পষ্ট একটা শিঙাধ্বনি। সূর্যের উজ্জ্বল আলোকের স্পষ্ট দূরের দৃশ্যাবলী। ঝলমল করছে ঝরনা আর ছাদের কিনার। সূর্যস্নাত সেমিরামিসের সারা দেহ। তাঁর ভঙ্গিতে পবিত্রতা।

আহা, দেখ দেখ ! অকস্মাৎ আপন মহিমায় উদিত আমার
সম্রাটকে দেখ :
যিনি দেন আবার ফিরিয়ে নেন,
যিনি সৃজন কোরে আবার আত্মসাৎ করেন।
উনি আসেন, চুরমার করেন আবার সবকিছুই যথাযথ রেখে যান।
বীজ বোনেন মাটিতে, অপলক চোখের পাতায় ভাবনা।
প্রণতি তোমাকে মহাকাল, তোমাকেই মেনেছি দর্পণ।
তোমারই প্রজ্বলিত নিবিড়তায় নিজেকে আত্মাহুতি দেবো,
কোথাও থাকবে না সেমিরামিসের এতটুকু গোপনীয়তা,
না কোনা ছায়া।

দ্বিতীয় দৃশ্যের মতো প্রায় নগ্ন, তিনি খুলে ফেললেন তার আবরণ

হে ঈশ্বর, আমি শুধু তোমাকেই জানি।
হে ঈশ্বরের ঈশ্বর, শুধু তুমি আর আমি···
আমার অমিত শক্তির সঞ্চয়ে শুধু এই ব্যাকুল কামনা।
[ মিনারপ্রাচীরে উঠে ] নিশ্বাস নেবো···
আমি কি নিশ্বাস নেবো অসীমের এই পবিত্র স্বচ্ছতায় ?
আমি দেখি, নিশ্বাস নিই আমার যাকিছু সৃষ্টির সেই উত্তুঙ্গতায়
কামনা-পরিত্যক্ত ঔদ্ধত্যে আমি লালিত !
সাম্রাজ্যের চেয়ে বিশাল আমার হৃদয়
এবং এমন কোনো
উত্তুঙ্গ মিনার নেই
যার উচ্চতায় আবিষ্কার করতে পারি
আমার এ হৃদয়ের সীমা পরিসীমা।
আমি এমনিই বড় হতে চেয়েছিলাম যা অনাগত মানুষ

কল্পনাও করতে পারবে না আমার অস্তিত্ব,
এমনিই পরাক্রান্ত অনন্যা রূপসী, যা মনে হবে বুঝি আত্মোৎসারিত।
সেমিরামিস সম্পর্কে ওরা বলবে "অকল্পনীয়, আশ্চর্য"...

প্রাচীর থেকে নেমে বেদীর কাছে এলেন। যেন প্রার্থনায়,
মুহূর্তের জন্যে থেমে উনি সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন

এখন বেদীর পাথরে নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে দেবো,
সূর্যের কাছে প্রার্থনা করবো অসীম ক্ষমায় তিনি যেন আমাকে
বাষ্প আর ভস্মে পরিণত করেন,
যার মাঝে এই মুহূর্তে
আমারই অসীম স্নেহে গর্বে লালিত এই পারাবতটি মুক্তি পায়।

বেদীর পাথরে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রসারিত করে দিলেন। প্রতিটি রত্নালঙ্কারের দীপ্তিতে তাঁকে মনে হলো যেন তীব্র আলোকের একটা চিতা। হালকা একটা কুয়াশা তাঁকে ঢেকে দিলো, তারপর লাফিয়ে যেন শূন্যে মিলিয়ে গেলো। একটা পারাবত ডানা মেললো আকাশে। শূন্য বেদীটা সূর্যের আলোকে উজ্জ্বল।

অনুবাদ / অসিত সরকার

লু স্যুন

## মুসাফির

কোনো এক বিদায় গোধূলিবেলা। পুবে রিক্ত কয়েকটা গাছ আর ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন। পশ্চিমে নির্জন কয়েকটা কাঁটাঝোপ ও অস্পষ্ট একটা পথের রেখা। পথের ঠিক পাশেই একটা ছোট্ট কুঁড়ে, দরজাটা হাট হাট খোলা। দরজার পাশে মরা একটা গাছের গুঁড়ি। গুঁড়ির ওপর বসে একজন বৃদ্ধ। বয়েস প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। ধবধবে সাদা চুল আর দাড়ি, পরনে আলখাল্লা। তামাটে চুল, টলটলে স্বচ্ছ কালো চোখ, বছর দশেকের একটি তরুণী বৃদ্ধকে তোলার চেষ্টা করছে।

বৃদ্ধ: কিরে! থামলি কেন? তোল।

তরুণী: [পুবের দিকে তাকিয়ে] দ্যাখো, কে যেন আসছে!

বৃদ্ধ: আসুক গে। তুই আমাকে ভেতরে নিয়ে চল। সূর্য যে অস্ত গেলো।

তরুণী: দাঁড়াও, একটু দেখি।

বৃদ্ধ: কি যে হচ্ছিস না দিন দিন! সারাদিনই তো দেখছিস—সেই একই আকাশ, মাটি আর বাতাস, তবু কি আশ মেটে না তোর? কি আছে অত ভালো কোরে দেখার, কে আসছে যাচ্ছে। জানিস তো এই ভর সন্ধ্যেবেলায় যারা আসে তারা শুভ নয়। বরং চ, ভেতরে যাই।

তরুণী: কিন্তু ওই যে, ও এসে পড়েছে। ওমা, ভিখিরি!

বৃদ্ধ: ভিখিরি? উঁহু, লক্ষণ তো ভালো নয়।

পুবের ঝোপ থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একজন মুসাফির মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করে বৃদ্ধের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। বয়েস ত্রিশ চল্লিশের মাঝামাঝি। ক্লান্ত, বিষণ্ণ। এলোমেলো রুক্ষ চুল, কালো গোঁফ। পরণে জীর্ণ, শতছিন্ন কালো কামিজ আর পাৎলুন, পায়ে মোজাবিহীন জুতো, পিঠে ঝোলা, হাতে দীর্ঘ বাঁশের লাঠি।

মুসাফির: নমস্কার, বাবুমশাই।

বৃদ্ধ: নমস্কার।

মুসাফির: যদি কিছু মনে না করেন, এক গেলাস জল পাবো? সারাদিন রোদে হেঁটে হেঁটে ঝলসে গেলাম, কোথাও এক ফোঁটা জলের চিহ্নও চোখে পড়লো না।

বৃদ্ধ: নিশ্চয়ই। বসো বসো। [তরুণীকে] যা তো, একটু জল নিয়ে আয়তো,

মা। দেখিস গেলাসটা যেন একটু পরিষ্কার হয়।

তরুণী নিঃশব্দের ঘরের মধ্যে প্রবেশ প্রবেশ করে

বসো। কি নাম তোমার ?

মুসাফির : নাম ? জানি না। মনেই পড়ে না আমার কোনোদিন নিজস্ব কোনো নাম ছিলো। যখন যেখানে গেছি, যার যা ভালো লেগেছে, সেই নামেই ডেকেছে আমাকে। কিন্তু এখন আর সে নামও আমার মনে নেই, কেননা একই নামে দুবার কেউ আমাকে কখনও ডাকেনি।

বৃদ্ধ : হুঁ, তা নয় বুঝলাম। কিন্তু আসছো কোথা থেকে ?

মুসাফির : [ইতস্তত করে] জানি না। মনেও নেই সেই কবে থেকে এই ভাবে হেঁটে চলেছি।

বৃদ্ধ : বেশ, তাও না হয় বুঝলাম। কিন্তু যাবেটা কোথায় ?

মুসাফির : তাও জানি না। কেবল হেঁটে চলেছি সামনে। শুধু এইটুকু মনে পড়ে দীর্ঘপথ হেঁটেছি আমি। এখন এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেচি। এবং এই পথে [পশ্চিমেব দিকে ইঙ্গিত করে] চলে যাবো দূরে।

তরুণী সন্তর্পণে এক গেলাস জল ওকে দিলো

মুসাফির : [গেলাসটা নিয়ে] ধন্যবাদ। [তারপব এক নিশ্বাসে সবটুকু পান করে গেলাসটা ফিরিয়ে দিয়ে] অসংখ্য ধন্যবাদ ! সত্যিই জানি না কি বলে যে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো।

বৃদ্ধ : এতে এত কৃতজ্ঞতা জানাবার কিছু নেই।

মুসাফির : হয়তো নেই, তবু এখন আমার ভীষণ ভালো লাগছে। এবার আমি অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবো। নিশ্চয়ই আপনারা এখানে অনেকদিন আছেন। সামনের পথটা কেমন হবে বলতে পারেন ?

বৃদ্ধ : সামনে ? সামনে তো কবব।

মুসাফির : [চমকে] কবর ?

তরুণী : না না ! ওখানে অজস্র পদ্ম আর বুনো-গোলাপের ঝোপ আছে। আমি প্রায়ই ওখানে বেড়াতে যাই, ওদেব দেখে আসি।

মুসাফির : [পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে] সত্যিই ওখানে অজস্র পদ্ম আর বুনো-গোলাপের ঝোপ আছে ? ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কত প্রহর যে আমার অনাবিল আনন্দে কেটে গেছে ! কিন্তু ওগুলো দেখে মনে হচ্ছে সত্যিই কবর। কবরের ওপারে কি আছে ?

বৃদ্ধ : কবরের ওপারে ? তা তো জানি না। কবরের ওপারে কি আছে কোনোদিনই দেখিনি আমি।

মুসাফির : কোনোদিনও দেখেননি আপনি ?

তরুণী : আমিও দেখিনি।

বৃদ্ধ : আমি যাকিছু জানি—উত্তর, দক্ষিণ আর পুব, যেদিক থেকে তুমি এলে তার সম্পর্কে কিছু। ওদিকের জায়গাগুলো আমার অত্যন্ত চেনা। হয়তো তোমার ভালোই লাগবে। তুমি যা ক্লান্ত, যদি কিছু মনে না করো তো বলি, আমার মনে হয় তোমার ফিরে যাওয়াই ভালো। কেননা তুমি যদি সামনে এগিয়ে যাও, হয়তো কোনোদিনই কোথাও পৌছতে পারবে না।

মুসাফির : কোনোদিনও কোথাও পৌছতে পারবো না [ কি যেন ভেবে, চলে যাওয়ার ভঙ্গিতে ] না, আমি কোথাও পৌছতে চাই না। আমি কেবল সামনেই এগুতে চাই। যদি ফিরে যাই, কোথাও এমন কোনো জায়গা নেই যা যন্ত্রণাবিহীন, শাসনবিহীন, নির্বাসনের মতো কেবলই খাঁচায় বন্দী, কোথাও এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে দুচোখের পাতা অশ্রুবিহীন। যেহেতু আমি ওসব ঘৃণা করি, তাই এখন আমার আর পেছনে ফেরার কোনো পথ নেই।

বৃদ্ধ : তুমি যা ভাবছো সবটা তাই নয়। হয়তো তুমি পেরিয়ে এসেছো হৃদয়ের অতল থেকে উঠে আসা কোনো অশ্রুর নদী, হয়তো গভীর যন্ত্রণা তোমাকে নুইয়ে দিয়েছে, তাই তোমার অমন মনে হচ্ছে।

মুসাফির : না না, আমি আর দেখতে চাই না হৃদয়ের অতল থেকে উঠে আসা কোনো অশ্রুর নদী কিংবা দুঃখের বিশাল সমুদ্র।

বৃদ্ধ : তাহলে তুমি সামনেই এগিয়ে যাবে ?

মুসাফির : হ্যাঁ, আমাকে সামনেই এগুতে হবে। তাছাড়া, কি এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর আমাকে কেবল টানছে, আমাকে কেবলই সামনে ডাকছে। আমি দুদণ্ড সুস্থির হয়ে কোথাও দাঁড়াতে পারি না। শুধু যন্ত্রণা আমার ক্লান্ত পা দুটোকে নিয়ে, কাঁটায় কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত কতবার যে রক্ত ঝরেছে ! [ একটা পা বৃদ্ধকে দেখিয়ে ] আমার তো আর অজস্র রক্ত নেই, তাছাড়া রক্ত আর কোথা থেকেই বা আসবে ? রাস্তার দুধারে যখনই যেখানে দেখেছি জলের চিহ্ন, ছুটে গেছি,

আকণ্ঠ পান করেছি আমি। শক্তির সঞ্চয় বলতে যা ছিলো, দীর্ঘদিন আগেই তা হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমার শরীরে রক্তের বদলে কেবল জল। অথচ আজ একটা সারাদিন জলের কোনো চিহ্নও চোখে পড়লো না, তাই বেশি দূর হাঁটতে পারিনি।

বৃদ্ধ: আহা! সূর্য তো অস্তই গেলো, রাতটুকু বিশ্রাম নিয়ে যাও না আমাদের এখানে।

মুসাফির: কিন্তু ওই উদাত্ত স্বর যে আমাকে ডাকছে।

বৃদ্ধ: আমি জানি।

মুসাফির: আপনি জানেন। আপনি কি কখনও শুনেছেন সেই কণ্ঠস্বর?

বৃদ্ধ: হ্যাঁ। মনে হয় আগেও সে বহুবার আমাকে ডাকছে। কিন্তু যেহেতু আমি উপেক্ষা করেছি, তাই সে ফিরে গেছে।

মুসাফির: ওঃ, আপনি উপেক্ষা করেছেন [ সামান্য একটু এগিয়ে কান পেতে ] না, তবু আমি যাবো। বিশ্রাম আমার জন্যে নয়। কিন্তু আমার ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত পাদুটো নিয়েই হয়েছে যত মুশকিল।

তরুণী: নিন, [ এক টুকরো কাপড় এগিয়ে ] এটা দিয়ে পাটা বেঁধে ফেলুন।

মুসাফির: ধন্যবাদ। [ কাপড়টা নিয়ে ] সত্যিই, তোমার কথা আমার অনেক দিন মনে থাকবে। এখন আমি অনেকটা পথ হেঁটে যেতে পারবো। [ পথের ওপরেই বসে পড়ে পাটা বাঁধার চেষ্টা করলো ] না, এতে হবে না [ উঠে দাঁড়িয়ে ] বড্ড ছোট। তুমি বরং এটা ফিরিয়ে নাও। অবশ্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার কোনো ভাষা নেই।

বৃদ্ধ: এতে কৃতজ্ঞতা জানাবার কোনো প্রশ্নই আসে না। তোমার কোনো কাজে এলো না সেটাই বড় কথা।

মুসাফির: হয়তো হলো না। কিন্তু এমন আশ্চর্য উপহার আমি কল্পনাও করতে পারছি না।

বৃদ্ধ: এভাবে বলার কোনো অর্থই হয় না।

মুসাফির: আমি জানি। কিন্তু না বলে যে পারছি না। ভয় হয় যখনই কেউ আমাকে কিছু দেয়, কেবলই মনে হয় আমি যেন এক বিশাল ঈগল, মুমূর্ষুর দিকে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে রয়েছি, মৃত্যু কামনা করে তার চারদিকে উড়ছি আর সেই মৃতদেহটা ছাড়া এ পৃথিবীর সবাইকেই অভিসম্পাত দিচ্ছি, যাতে সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু আমি

নিজেই যে অভিশপ্ত, এমন কি অভিসম্পাতেরও অতীত। তবু কোনো-দিন চাইনি মানুষের এমন পরিণতি, কেননা কেউই চায় না, চাইতে পারে না। [ তরুণীকে ] বড্ড ছোট, নইলে কাপড়টা বেশ ভালোই। এটা বরং তোমার কাছে রেখে দাও।

তরুণী : [ সসংকোচে পেছিয়ে এসে ] না না, ওটা আপনিই রাখুন।

মুসাফির : [ ম্লান হেসে ] কেন, ছুঁয়েছি বলে ?

তরুণী : না না, ঠাট্টা করবেন না। ঝোলাটা দেখিয়ে ] ওটা বরং ওখানেই রেখে দিন।

মুসাফির : কিন্তু এটাকে মিছিমিছি বয়ে বেড়িয়ে কি লাভ ?

বৃদ্ধ : শোনো, তুমি ক্লান্ত, বরং একটু বিশ্রাম নিয়ে যাও।

মুসাফির : সেই ভালো, একটু বিশ্রাম·· [ চকিতে কি যেন ভেবে, গভীর স্বরে ] না না, তা আমি পারি না। যেতে আমাকে হবেই।

বৃদ্ধ : তুমি কি ভাবো বিশ্রামের একটুও প্রয়োজন নেই ?

মুসাফির : আমি জানি আছে।

বৃদ্ধ : বেশ তাহলে এখানে একটু বিশ্রাম করে নাও।

মুসাফির : আমি তা পারি না।

বৃদ্ধ : তুমি কি এখনও ভাবো চলে যাওয়াই ভালো ?

মুসাফির : হ্যাঁ, মনে হয় আমার চলে যাওয়াই ভালো।

বৃদ্ধ : বেশ তাহলে যাও।

মুসাফির : বিদায়, আপনাদের দুজনকেই বিদায়। [ তরুণীকে ] তোমার কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ, অনুগ্রহ করে এটা বরং তুমি রাখো। [ সলজ্জ ভঙ্গিতে তরুণী ছুটে পালালো একটু দূরে ] লক্ষ্মীটি শোনো···

বৃদ্ধ : ওটা তুমিই নিয়ে যাও। যদি খুব বেশি ভারি লাগে কবরের কাছে কোথাও ফেলে দিও।

তরুণী : না না, ওখানে ফেলবেন না।

মুসাফির : না, তা আমি পারি না।

বৃদ্ধ : তাহলে ওটা ঝুলিয়ে দিও পদ্ম কিংবা কোনো বুনো-গোলাপের ঝোপে।

তরুণী : [ উচ্ছল হাততালি দিয়ে ] সেই বরং ভালো।

মুসাফির : [ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ] আঃ!

মুহূর্তের জন্যে বিরতি

বৃদ্ধ : তাহলে বিদায়। যাত্রা তোমার শুভ হোক। [ উঠে, তরুণীর দিকে ] আমাকে ভেতরে নিয়ে চল। ইশ্, সূর্য যে একেবারে ডুবে গ্যাছে।

মুসাফির : আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ। মঙ্গল হোক। [ মুহূর্তের জন্মে কি যেন ভেবে তারপর চলতে শুরু করলো ] না, তা হয় না, যেতে আমাকে হবেই। বিদায়।

তরুণী বৃদ্ধকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলো। মুসাফির খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অথচ স্থির সংকল্পে এগিয়ে চললো পশ্চিমের রুক্ষতার দিকে। ওর পেছনে পায়ে পায়ে নেমে এলো অন্ধকার।

অনুবাদ / অসিত সরকার

ফেদেরিকো গার্থিয়া লরকা

# ডন পারলিম্পলিনের ভালোবাসা

## পূর্বাভাস

ডন পারলিম্পলিনের ঘর। দেওয়ালগুলো সবুজ রঙ করা। কালো আবলুস কাঠের কুর্সি আর আসবাবপত্র। পেছন দিকে একটা বড় জানলা সুসংলগ্ন ঝুল-বারান্দা, যেখান থেকে বেলিসার ঝুল-বারান্দাটা দেখা যায়। ভেসে আসছে সোনাটার 'সুর। পারলিম্পলিনের পরণে সবুজ ঢিলে বহির্বাস, তাতে অজস্র ভাঁজ। পরিচারিকা, মার্কোফার পরনে বেশ শোভন ডোরাকাটা ফ্রক।

পারলিম্পলিন : সত্যি ?

মার্কোফা : হ্যাঁ।

পারলিম্পলিন : কিন্তু কেন 'হ্যাঁ' ?

মার্কোফা : এমনিই যেহেতু হ্যাঁ।

পারলিম্পলিন : আর আমি যদি বলি 'না' ?

মার্কোফা : [ তীক্ষ্ণ স্বরে ] না ?'

পারলিম্পলিন : হুঁ, না।

মার্কোফা : বেশ তো, তাহলে বলো সেই 'না'-টা কেন ?

পারলিম্পলিন : তুমিই বলো না সেই 'হ্যাঁ'-টা কেন ?

বিরতি

মার্কোফা : কুড়ি আর কুড়ি চল্লিশ···

পারলিম্পলিন : [ মন দিয়ে শুনে ] হুঁ।

মার্কোফা : আর দশ, পঞ্চাশ।

পারলিম্পলিন : বেশ।

মার্কোফা : পঞ্চাশ বছর বয়েসে নিশ্চয়ই কেউ আর কচি খোকা নয়।

পারলিম্পলিন : তা তো নয়ই।

মার্কোফা : এবং কে যে কখন মরবে কেউ বলতে পারে না॥

পারলিম্পলিন : ঠিক

মার্কোফা : [ চোখের জল মুছতে মুছতে ] তাহলে এ পৃথিবীতে তোমার একা বেঁচে থেকে কি লাভ ?

পারলিম্পলিন : কিন্তু আমায় কি করতে হবে ?

মার্কোফা : এখন তোমার বিয়ে করা উচিত।

পারলিম্পলিন : সত্যিই !

মার্কোফা : হ্যাঁ।

পারলিম্পলিন : [বিষণ্ণ স্বরে] কিন্তু কেন, মার্কোফা ? আমি যখন ছোট ছিলাম, একজন প্রতিবেশিনী তার স্বামীকে গলা টিপে মেরেছিলো। লোকটা ছিলো মুচি। সেই দৃশ্য আজও ভুলতে পারিনি। বড় হবার পর প্রায়ই বলতাম আমি আর কোনোদিনও বিয়ে করবো না। বই-ই আমার ভালো। বিয়ে করে কি হবে ?

মার্কোফা : বিয়েটাই তো আসল, লুকনো রহস্যের চাবিকাঠি। ঝি হয়ে আর কি বলবো···তুমি তো বুঝতেই পারছো···

পারলিম্পলিন : সেটা কি ?

মার্কোফা : বলতে আমার লজ্জা করছে।

বিরতি। পিয়ানোর সুর। নেপথ্যে বেলিসার গান

বেলিসার কণ্ঠস্বর : আঃ, ভালোবাসা, ভালোবাসা !

আমার দু উরুর মাঝে বন্দী সূর্যটা
যেন একটা মাছের মতো সাঁতার দেয়।
উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জলোচ্ছ্বাস।
আঃ, ভালোবাসা
ভোরের ঘণ্টাধ্বনিতে রাত শেষ হয়ে আসে,
তুমি নিঃস্ফল তাকে চলে যেতে দিও না !

মার্কোফা : কি, শুনলে তো ?

পারলিম্পলিন : [ মাথা চুলকোতে চুলকোতে ] সত্যিই ও বেশ ভালো গায়।

মার্কোফা : রূপসী বেলিসাই আমার মনিবের উপযুক্ত পাত্রী।

পারলিম্পলিন : বেলিসা। কিন্তু আমার তুলনায় বড্ড বেশি ভালো হয়ে যাচ্ছে না ?

মার্কোফা : মোটেই না। বেশ তো, দেখাই যাক না। [ তার হাত ধরে টানতে টানতে ঝুল-বারান্দায় নিয়ে এলো ] বলো, বেলিসা।

পারলিম্পলিন : বেলিসা···

মার্কোফা : জোরে।

পারলিম্পলিন : বেলিসা !

বাড়ির অন্যদিকের ঝুল-বারান্দার দরজাটা খুলে গেলো। সুন্দর, স্বচ্ছ পোশাকে আশ্চর্য রূপসী বেলিসাকে দেখা গেলো। কিছুটা অবিন্যস্ত।

বেলিসা : কে ?

মার্কোফা দ্রুত জানলার পরদার আড়ালে লুকলো।

মার্কোফা : বলো, বলো, কথা বলো !

পারলিম্পলিন : [ কাঁপা কাঁপা গলায় ] আমি ।

বেলিসা : বলুন।

পারলিম্পলিন : বলবো ?

বেলিসা : বলুন।

পারলিম্পলিন : কি বলবো ?

বেলিসা : আপনার যা খুশি।

পারলিম্পলিন : আমি, মানে আমরা···না না, আমি মানে নিজে—ঠিক করে ফেললাম বিয়ে করবো।

বেলিসা : [ হাসতে হাসতে ] বেশ তো। কিন্তু কাকে ?

পারলিম্পলিন : তোমাকে।

বেলিসা : [ বিস্ময়ে ] আমাকে ! কিন্তু···[ চেঁচিয়ে ] মা ! মা ! মামণি !

মার্কোফা : এই তো বেশ জমেছে !

অষ্টাদশ শতাব্দীর রীতিমতো জমকালো পোশাকে মার প্রবেশ। গলায় পুঁতির মালা

বেলিসা : ডন পারলিম্পলিন আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন। কি করি বলোতো ?

মা : সত্যিই তোমাকে আন্তরিক সুসন্ধ্যা জানাচ্ছি, ডন পারলিম্পলিন। বেলিসাকে তোমার মায়ের কথা আমি প্রায়ই বলতাম। যদিও ওঁনার সঙ্গে আমার আলাপ করার তেমন সুযোগ হয়ে ওঠেনি, তবু অমন রূপসী, মার্জিত রুচির মহিলা আমি খুব কমই দেখেছি।

পারলিম্পলিন : অসংখ্য ধন্যবাদ।

মার্কোফা : [ আড়াল থেকেই ] আমরা ভেবেছি সামনের মাসেই··

পারলিম্পলিন : আমরা ভেবেছি সামনের মাসেই

মা : পাকা কথাটা সেরে নেবে, তাই না ?

পারলিম্পলিন : হ্যাঁ।

বেলিসা : কিন্তু আমার কি হবে, মা ?

মা : এতে তোমার কিন্তু আপত্তি করা উচিত নয়, বেলি। ডন পারলিম্পলিন ছেলে হিসেবে বেশ ভালোই।

পারলিম্পলিন : আমার মনে হয় খুব একটা অযোগ্য হবো না।

মার্কোফা : [ পারলিম্পলিনকে ] ব্যাপারটা তাহলে প্রায় মিটেই গেলো।

পারলিম্পলিন : [ নিচু গলায় ] তোমার কি মনে হয় ?

দুজনে চুপিচুপি কথা বলে

মা : [ বেলিসাকে ] ডন পারলিম্পলিনদের অঢেল জায়গা-জমি। জায়গা-জমি মানেই সম্পদ। আর সম্পদ মানেই আভিজাত্য। আভিজাত্যই তো মানুষের সব।

পারলিম্পলিন : তাহলে ?

মা : একটু ভেতরে যাও তো বেলিসোনা। বিয়ে কনেদের এসব কথা শুনতে নেই।

বেলিসা : যাচ্ছি।

বেলিসা চলে যায়

মা : ঠিক পদ্মের মতো। মুখখানা দেখলে ? পরে ভালো কোরে দেখলে বুঝতে পারবে কি মিষ্টি। অবশ্য তোমার মতো আধুনিক, রুচিবান ছেলেকে এসব বলার কোনো মানেই হয় না।

পারলিম্পলিন : সত্যি ?

মা : নিশ্চয়ই, তা নয় তো কি ! আমি তো আর ঠাট্টা করছি না।

পারলিম্পলিন : সত্যি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার কোনো ভাষা নেই।

মা : না না, কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনো প্রশ্নই আসে না। সত্যিই আমি অসম্ভব খুশি হয়েছি। আর কৃতজ্ঞতা যদি জানাতেই হয় তো সে তোমাকে, তোমার অন্তরের কাছে…

মার্কোফা : [ পাশ থেকে ] তাহলে বিয়েটা ?

পারলিম্পলিন : তাহলে বিয়েটা…

মা : সেটা তোমার যেদিন খুশি। [ রুমালে চোখ মুছতে মুছতে ] কোনো মা-ই চায় না মিছিমিছি দেরি করতে। চলি, পরে আবার দেখা হবে।

উনি চলে গেলেন

মার্কোফা : যাক, শেষ পর্যন্ত তাহলে ব্যাপারটা মিটলো !

পারলিম্পলিন : কিন্তু মার্কোফা, এ তুমি আমাকে কোন্ পৃথিবীতে ঠেলে দিলে বলো তো ?

মার্কোফা : গন্ধর্বের পৃথিবীতে।

পারলিম্পলিন : উঃ, তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে ! এক গেলাস জল না পেলে সত্যিই মরে যাবো।

মার্কোফা : [ এগিয়ে এসে কানের কাছে ] এর মধ্যেই তেষ্টা পেয়ে গেলো ?

পিয়ানোর শব্দ। মঞ্চ অন্ধকার। বেলিসা তার বারান্দার সামনের জানলার পরদাটা সরিয়ে দিলো। অবসন্ন তার গানেব সুর।

আঃ, ভালোবাসা, ভালোবাসা।
আমার দু উরুর মাঝে বন্দী সূর্যটা
যেন একটা মাছের মতো সাঁতার দেয়।

মার্কোফা : মেয়েটা সত্যিই বেশ ভালো।

পারলিম্পলিন : হ্যাঁ, খুব মিষ্টি। আচ্ছা, আমাকে আবার গলা টিপে মেরে ফেলবে না তো ?

মার্কোফা : মেয়েরা এমনিতেই দুর্বল। ঠিক সময়ে ভয় পাইয়ে দিলে ওরা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

বেলিসার কণ্ঠস্বর : আঃ, ভালোবাসা
ভোরের ঘণ্টাধ্বনিতে রাত শেষ হয়ে আসে,
তুমি নিঃস্ফল তাকে চলে যেতে দিও না।

পারলিম্পলিন : ও কি বলতে চাইছে ? এ গানেব মানেটা কি, মার্কোফা ? [মার্কোফা হাসতে থাকে ] আমাব যে কি হয়েছে আমি নিজেই জানি না।

তখনও অস্পষ্ট ভেসে আসতে থাকে পিয়ানোর সুর। বারান্দা অতিক্রম করে উড়ে যায় এক ঝাঁক কালো কাগজের পাখি।

## প্রথম দৃশ্য

ডন পারলিম্পলিনে ঘর। মাঝখানে ফুল দিয়ে সাজানো সুন্দর বড একটা বিছানা। ফুলশয্যার রাত। পেছনের দেওয়ালে ছটা দরজা। ডানদিকের প্রথম দরজাটা পারলিম্পলিনের ভেতরে যাওয়া-আসার জন্যে। দীপাধার হাতে মার্কোফা বাঁদিকের দরজার সামনে দাঁড়িযে।

মার্কোফা : শুভরাত্রি।

বেলিসা : [ মঞ্চের ওপার থেকে ] শুভরাত্রি, মার্কোফা।

অত্যন্ত সুন্দর পোশাকে ডন পারলিম্পলিনের প্রবেশ

মার্কোফা : আমার প্রভুর ফুলশয্যার রাত্রি শুভ হোক।

পারলিম্পলিন : শুভরাত্রি, মার্কোফা। [ মার্কোফা চলে গেলো। সন্তর্পণে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে তাকিয়ে ] বেলিসা, তোমার ঝালর দেওয়া পোশাকের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যেন উত্তাল তরঙ্গমালা, এবং তুমি আমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলে শৈশবে সেই সমুদ্রের ভয়। যখনই গির্জা থেকে বাড়ি ফিরে এসেছো, সারাটা ঘর ভরে উঠেছে গোপন গুঞ্জরণে। গেলাসের জল উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আপনা থেকেই। আঃ, পারলিম্পলিন, কোথায় ছিলে, আর এখন তুমি কোথায় !

পারলিম্পলিন বেরিয়ে যাবার পর বেলিসা প্রবেশ করলো। বধূর বেশে, ঝালর দেওয়া সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিতা

বেলিসা :, আঃ ফুল আর লতার সুগন্ধে ভরে আছে সারা ঘর। [বিছানার দিকে এগিয়ে গেলো। ভেসে এলো গিটারের মিষ্টি একটা সুর ] যে-ই আমাকে চাক না কেন, দেখবে কি উচ্ছল প্রদীপ্ত আমি। ঝরনার জলেও আমার তৃষ্ণা যেন কোনোদিনও মিটবে না। আঃ, এ গানের সুরে আমি যেন রাজহংসীর উষ্ণ, কোমল ডানার মতো ভেসে যাবো !

দূর থেকে যত শোনা গেলো পাঁচটা বাঁশির শব্দ

বেলিসা : পাঁচবার !

পারলিম্পলিন : [ ভেতরে প্রবেশ করে ] তোমাকে বিরক্ত করলাম না তো ?

বেলিসা : ওমা, সেকি !

পারলিম্পলিন : তোমার কি ঘুম পেয়ে গ্যাছে ?

বেলিসা : [ ব্যঙ্গের সুরে ] কেন, ঘুম পেতে যাবে কোন্ দুঃখে ?

পারলিম্পলিন : রাতটা কেমন সুন্দর আর হিমেল হয়ে উঠেছে ছাখো !

পারলিম্পলিন হাতে হাত ঘষে। বিরতি

বেলিসা : পারলিম্পলিন।

পারলিম্পলিন : বলো ?

বেলিসা : [ আলতো স্বরে ] নামটা কি সুন্দর—পারলিম্পলিন !

পারলিম্পলিন : তোমার নামটা আরও সুন্দর—বেলিসা !

বেলিসা : [ হাসতে হাসতে ] যাও !

অল্পক্ষণের জন্যে বিরতি

পারলিম্পলিন : তোমাকে কয়েকটা কথা বলবো ভেবেছি।

বেলিসা : বলো।

পারলিম্পলিন : যদিও মনস্থির করতে আমি নিজেই দেরি করে ফেলছি, তবু…

বেলিসা : আহা, বলেই ফ্যালো না।

পারলিম্পলিন : আমি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, বেলিসা।

বেলিসা : ওটা তোমার কর্তব্য।

পারলিম্পলিন : সত্যি ?

বেলিসা : হ্যাঁ।

পারলিম্পলিন : কিন্তু কেন ?

বেলিসা : এমনিই।

পারলিম্পলিন : না।

বেলিসা : পারলিম্পলিন !

পারলিম্পলিন : না বেলিসা, বিয়ের আগে আমি তোমাকে এমন করে ভালোবাসতে পারিনি।

বেলিসা : এ তুমি কি বলছো ?

পারলিম্পলিন : বিশ্বাস করো, যেকোনো কারণেই হোক, এখন আমি বিবাহিত, অথচ আগে তোমাকে ভালোবাসতে পারিনি। চাবির গর্ত দিয়ে তোমাকে বিয়ের পোশাক পরতে দেখার আগে আমি কল্পনাই করতে পারিনি তোমার শরীর। তখনই যেন ভালোবাসা এসে পৌঁছলো আমার কাছে। গভীর তৃষ্ণা বিঁধে গেলো আমার কণ্ঠনালীতে।

বেলিসা : [ রহস্যময় ভঙ্গিতে ] আর অন্য মেয়েরা ?

পারলিম্পলিন : অন্য মেয়েরা মানে ?

বেলিসা : আগে যাদের তুমি চিনতে।

পারলিম্পলিন : আগে আমি আবার কাদের চিনতাম ?

বেলিসা : সত্যিই তুমি অবাক করলে !

পারলিম্পলিন : এই প্রথম আমি অবাক হলাম নিজেই।

পাঁচবার বাঁশির শব্দ শোনা গেলো

এটা আবার কি ?

বেলিসা : ঘড়ি।

পারলিম্পলিন : তার মানে এখন পাঁচটা ?

বেলিসা : হ্যাঁ, এবার শুতে হবে।

পারলিম্পলিন : যদি কিছু মনে না করো আমি কি কোটটা খুলে ফেলবো ?

বেলিসা : নিশ্চয়ই। [হাই তুলে] ইচ্ছে করলে আলোটাও নিভিয়ে দিতে পারো।

পারলিম্পলিন আলোটা নিভিয়ে দিলো

পারলিম্পলিন : [ চাপা স্বরে ] বেলিসা ?

বেলিসা : বলো।

পারলিম্পলিন : [ ফিসফিসিয়ে ] আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

বেলিসা : দেখলাম।

পারলিম্পলিন : [ আরও চাপা স্বরে ] বেলিসা ?

বেলিসা : কি সোনামণি ?

পারলিম্পলিন : আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি।

পাঁচবার তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ। বিছানা উন্মুক্ত। মঞ্চের উলটো দিক থেকে দুটি আত্মা প্রবেশ করলো। নেমে এলো হালকা একটা কুয়াশার পরদা। মঞ্চ অন্ধকারে মোড়া। ঘুমের মতো মিষ্টি একটা মেঠো বাঁশি সুর। আত্মাদুটি শিশুদের, দর্শকদের দিকে মুখ করে মঞ্চের দুপ্রান্তে দুজনে বসলো।

প্রথম আত্মা : এই অন্ধকারে কেমন লাগছে ?

দ্বিতীয় আত্মা : ভালো নয়, আবার মন্দও নয়।

প্রথম আত্মা : তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা এখানে এসে পৌছলাম !

দ্বিতীয় আত্মা : অন্য মানুষের ব্যর্থতাকে ঢেকে দিতে সত্যিই বেশ ভালো লাগে।

প্রথম আত্মা : ওরা নিজে থেকে কোনো দিনই আবিষ্কৃত হবে না।

দ্বিতীয় আত্মা : [ পরদার দিকে তাকিয়ে ] ওখানে কোনো ছেঁড়াটেঁড়া নেই তো ?

প্রথম আত্মা : আজকে দিনে যা ছেঁড়া কাল তা গাঢ় অন্ধকারে মোড়া।

ওরা হাসাহাসি করলো

দ্বিতীয় আত্মা : সবকিছুই যখন সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়ে যায়…

প্রথম আত্মা : মানুষ ভাবে তার কোনো প্রয়োজনই নেই ওদের আবিষ্কার করার…ওদের রহস্য তার ইতিমধ্যেই জানা হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় আত্মা : ওদের আবিষ্কার করবে বলে সে চলেছে অন্ধকারের দিকে… ওদের রহস্য তার ইতিমধ্যেই জানা হয়ে গেছে।

প্রথম আত্মা : আর সেই জন্যেই তো আমরা আত্মারা আজ এখানে এসেছি।

দ্বিতীয় আত্মা : পারলিম্পলিনকে তুমি চেনো নাকি ?

প্রথম আত্মা : সেই শৈশব থেকে।

দ্বিতীয় আত্মা : আর বেলিসাকে ?

প্রথম আত্মা : খুব ভালো করে। একবার ওর ঘরে উগ্র নির্যাসের গন্ধে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, জেগে উঠেছিলুম ওর বেড়ালের দু থাবার মাঝে।

ওরা হাসলো

দ্বিতীয় আত্মা : কিন্তু এই যে ব্যাপারটা ঘটলো…

প্রথম আত্মা : হ্যাঁ, এটা সত্যিই রহস্যময় !

দ্বিতীয় আত্মা : পারলিম্পলিনের হৃদয় যেন ছোট্ট, ভীরু, নবজাত একটা তিতিরের মতো, এই মুহূর্তে কেমন আপ্লুত, মগ্ন হয়ে আছে।

প্রথম আত্মা : দর্শকরা অধৈর্য হয়ে উঠছে।

দ্বিতীয় আত্মা : তার অবশ্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আমরা কি চলে যাবো ?

প্রথম আত্মা : সেই ভালো। মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই স্বচ্ছ বাতাস এসে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে।

দ্বিতীয় আত্মা : শোবার ঘরের দেওয়ালে নিশান্তিকার পাঁচটা হিমেল ক্যামেলিয়া মেলে দিয়েছে তাদের পাপড়ি।

প্রথম আত্মা : শহরের বুকে উন্মুক্ত হয়ে গেছে পাঁচটা ঝোলানো বারান্দা।

ওরা উঠে দাঁড়ালো, নীল অবগুণ্ঠণে ঢেকে নিলো নিজেদের

দ্বিতীয় আত্মা : ডন পারলিম্পলিন, আমরা তোমাকে সাহায্য করবো না বাধা দেবো ?

প্রথম আত্মা : সাহায্যই করো। কেননা এমন সরল একটা মানুষের দুর্ভাগ্যকে এভাবে দর্শক-সাধারনের সামনে ফেলে রাখাটা শোভন নয়।

দ্বিতীয় আত্মা : সত্যিই, এভাবে বলাটা ঠিক নয় যে 'আমার যা দেখার ছিলো দেখা হয়ে গেছে !'

প্রথম আত্মা : কালই সারাটা পৃথিবী সব জেনে যাবে।

দ্বিতীয় আত্মা : আমরাও তাই চাই।

প্রথম আত্মা : কানাকানির একটা শব্দেই পৃথিবী মুখর হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় আত্মা : চুপ···

শোনা গেলো বাঁশির সুর

প্রথম আত্মা : আমরা কি ওই ছোট্ট অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলে যাবো ?

দ্বিতীয় আত্মা : সেই ভালো।

প্রথম আত্মা : এখন ?

দ্বিতীয় আত্মা : হ্যাঁ, এখনই।

পরদা সরিয়ে ওরা চলে গেলো। পারলিম্পলিনকে বিছানার সামনে দেখা গেলো। মাথায় উজ্জ্বল শিং। পাশে বেলিসা। মঞ্চের পেছনে উন্মুক্ত পাঁচটা বারান্দা, তা থেকে ভোরের আলো এসে পড়েছে।

পারলিম্পলিন : [ জেগে ] বেলিসা ! বেলিসা ! শুনছো ?

বেলিসা : [ জাগার ভান করে ] কি ব্যাপার ?

পারলিম্পলিন : না, তুমি আমাকে শিগগির বলো।

বেলিসা : কি বলবো ? আমি তো তোমার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পারলিম্পলিন : [ ঢিলে বহির্বাসেই বিছানা থেকে নেমে ] বারান্দার জানলাগুলো খোলা কেন ?

বেলিসা : কাল রাতের মতো এমন উন্মত্ত বাতাস আর কখনও বয়নি।

পারলিম্পলিন : বারন্দা থেকে পাঁচটা সিঁড়ি কেন মাটিতে নেমে গেছে ?

বেলিসা : আমার মায়ের দেশে যে এই রকমই রীতি।

পারলিম্পলিন : আর বারান্দার নিচে ওই পাঁচটা টুপি কার ?

বেলিসা : [ বিছানা থেকে নেমে ] হয়তো পাঁচটা মাতালের, লুকিয়ে এসে আবার যারা ফিরে গেছে। পারলিম্পলিন, প্রিয়তম আমার !

পারলিম্পলিন বোকার মতো ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো

পারলিম্পলিন : বেলিসোনা ! কি সুন্দর তুমি আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিলে। আমি খুব খুশি হয়েছি। কেন, এমনটা তো হতেই পারে !

বেলিসা : নিশ্চয়ই, আমি তো আর মিথ্যুক নই।

পারলিম্পলিন : আ:, প্রতিমুহূর্তেই তোমাকে যে আমার কি ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে !

বেলিসা : আমারও খুব ভালো লাগছে।

পারলিম্পলিন : জীবনে এই প্রথম নিজেকে আমার আশ্চর্য সুখী মনে হচ্ছে! [ এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে সরে আসে ] বেলিসা, কে তোমাকে চুমু খেয়েছে ? মিথ্যে বোলো না, কেননা আমি জানি!

বেলিসা : [ এলোমেলো চুলগুলো দুহাতে ঠিক করতে করতে ] নিশ্চয়ই তুমি জানো। আমি তো জানি, আমার কি দুষ্টু একটা স্বামী। [ নিচু স্বরে ] তুমি! তুমিই চুমু খেয়েছো আমাকে!

পারলিম্পলিন : হ্যাঁ, আমিই চুমু খেয়েছি তোমাকে। কিন্তু···ধরো যদি অন্য কেউ তোমাকে চুমু খেতো, তবু···তবু তুমি আমাকে ভালোবাসতে ?

বেলিসা : [ নগ্ন হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরে ] হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

পারলিম্পলিন : তাহলে আমি আর কোনো কিছুতে ভয় পাই না। [ওকে আদর করতে করতে ] তুমি বেলিসা ?

বেলিসা : হ্যাঁ, হ্যাঁ গো হ্যাঁ!

পারলিম্পলিন : মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা স্বপ্নের মতো!

বেলিসা : সবাই জেগে ওঠার আগে বারান্দার জানলাগুলো বন্ধ করে দাও না লক্ষ্মীটি।

পারলিম্পলিন : জেগে উঠলেই বা ? আমরা অনেক ঘুমিয়েছি, এবার নিশান্তিকা দেখবো। তোমার ভালো লাগবে না ?

বেলিসা : হ্যাঁ, কিন্তু···

পারলিম্পলিন : সূর্য ওঠার কাল আমি কখনও দেখিনি।

যেন নিভে গিয়ে বেলিসা বালিশে মাথা রাখলো

এ এমনই এক দৃশ্য, যা মনে হবে অবাস্তব·· ভাবতেই আমার রোমাঞ্চ লাগছে! তোমার ভালো লাগছে না ? [বিছানার কাছে গিয়ে ] এই তুমি ঘুমিয়ে পড়লে ?

বেলিসা : [ যেন স্বপ্নের অতল থেকে ] হ্যাঁ।

পারলিম্পলিন সতর্ক পায়ে ওর কাছে গিয়ে সন্তর্পনে ওকে লাল ওড়নায় ঢেকে দিলো। বারান্দা থেকে এসে পড়েছে সোনালী আলোর রেখা। প্রভাতী ঘন্টা-ধ্বনির মাঝেই ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেলো কাগজের পাখি। শয্যাপ্রান্তে পার-লিম্পলিন একই ভাবে বসে রইলো।

পারলিম্পলিন : ভালোবাসা, ক্ষত-বিক্ষত ভালোবাসা
এখানে গভীর ঘুমিয়ে।

ভালোবাসার পদসঞ্চারে সে এমনই ক্ষত-বিক্ষত
যেন মুমূর্ষু।
সবাই জানুক এ শুধু পাপিয়ার গান, আর কিছু নয়।
রক্তাক্ত কণ্ঠনালীতে এ শুধু তীক্ষ্ণ ফলা ছোট্ট একটা ছুরি,
তারপরেই বিস্মরণ।
নিবিড় আলিঙ্গনে আমাকে জড়িয়ে ধরো, ভালোবাসা আমার
কেননা আমি সত্যিই ক্ষত-বিক্ষত,
ভালোবাসার পদসঞ্চারে এমনই ক্ষত-বিক্ষত, যেন মুমূর্ষু!

## দ্বিতীয় দৃশ্য

ডন পারলিম্পলিনের খাবার ঘর। সমস্ত পরিবেশটাই কেমন যেন অগোছালো। আসবাবপত্র এবং টেবিলের ওপর যাকিছু সবই অশান্ত প্রাচীন ধরনের এবং রঙ করা।

পারলিম্পলিন: তাহলে যা বললাম সব মনে আছে তো?

মার্কোফা: [ কাঁদতে কাঁদতে ] তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

পারলিম্পলিন: কিন্তু মার্কোফা, তুমি কাঁদছো কেন?

মার্কোফা: সে শুধু ঈশ্বরই জানেন। ফুলশয্যার রাতে পাঁচজন মানুষ
বারান্দা পেরিয়ে ঢুকলো তোমার ঘরে ··পাঁচ পাঁচজন মানুষ,
অথচ তুমি কিছুই জানতে পারলে না।

পারলিম্পলিন: ওটা গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপারই নয়।

মার্কোফা: কিন্তু গতকালই ওকে দেখলাম অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে।

পারলিম্পলিন: [ বিহ্বল ভঙ্গিতে ] সত্যি?

মার্কোফা: এমন কি আমার কাছেও এতটুকুও লুকোলো না।

পারলিম্পলিন: কিন্তু আমি যে সত্যিই সুখী, মার্কোফা।

মার্কোফা: আমাকে অবাক করলে তুমি।

পারলিম্পলিন: আমি যে কি সুখী তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।
মনে হচ্ছে আমার ভেতরটা যেন আলোকিত হয়ে গেছে।

মার্কোফা: তুমি ওকে অসম্ভব ভালোবাসো তাই।

পারলিম্পলিন: যতটা ওর যোগ্য নিশ্চয়ই ততটা নয়।

মার্কোফা: ওই, ও আসছে।

পারলিম্পলিন : লক্ষ্মীটি তুমি এখন যাও।

মার্কোফা চলে গেলে পারলিম্পলিন এক কোণে আত্মগোপন করে। বেলিসা প্রবেশ করলো। কালো ঘাঘরা আর রেশমী মোজায় সজ্জিত। কানে বেশ বড় মাকড়ি, মাথায় উট পাখির পালক গোঁজা লাল টুপি।

বেলিসা : এবারেও আমি ওর দেখা পেলাম না। পার্কের মধ্যে দিয়ে যখন হাঁটছিলাম, ও ছাড়া আর সবাই ছিলো আমার পেছনে। ওর গায়ের রঙ কালো, আশ্চর্য উত্তপ্ত আর লবঙ্গ ফুলের মতো সুগন্ধি ওর চুম্বন। কখনও কখনও ও চলে যায় আমার বারান্দার নিচে দিয়ে, ওর ধীর নিঃশব্দ অভিবাদনের ভঙ্গিতে কেঁপে ওঠে আমার বুক।

পারলিম্পলিন : [ গলা খাঁকরি দিয়ে ] উঁহু !

বেলিসা : [ চমকে ] ওমা, তুমি ! উঃ, যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে !

পারলিম্পলিন : [ কাছে এসে ] দেখলাম তুমি নিজে নিজেই কথা বলছো।

বেলিসা : বিরক্তির স্বরে ] যাও !

পারলিম্পলিন : চলো না, দুজনে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি ?

বেলিসা : না।

পারলিম্পলিন : তাহলে কিছু কিনে আনি ?

বেলিসা : বললাম তো—না।

পারলিম্পলিন : বেশ।

ঢেলায় জড়ানো একটা চিঠি এসে পড়লো ঘরের ভেতরে পারলিম্পলিন তুলে নিলো।

বেলিসা : আমাকে দাও।

পারলিম্পলিন : কেন ?

বেলিসা : যেহেতু এটা আমার।

পারলিম্পলিন : তুমি কেমন করে জানলে ?

বেলিসা : পোড়ো না, লক্ষ্মীটি !

পারলিম্পলিন : তার মানে ?

বেলিসা : [ কান্নার মতো ঠোঁট ফুলিয়ে ] চিঠিটা আমাকে দাও।

পারলিম্পলিন : রাগ কোরো না, বেলিসোনা ! এই নাও, অন্তত এটা যখন তোমার। [ চিঠিটা নিয়ে বেলিসা বুকের মধ্যে গুঁজে রাখে ] এখন আমি যেন সবকিছুই স্পষ্ট বুঝতে পারি। যদিও ব্যথা

পাই, তবু অনুভব করতে পারি তুমি বাস করছো সুন্দর একটা রঙিন স্বপ্নে।

বেলিসা : [ কোমল স্বরে ] পারলিম্পলিন !

পারলিম্পলিন : আমি জানি আমার প্রতি তুমি বিশ্বস্ত এবং চিরটা কালই তুমি তা থাকবে।

বেলিসা : [ আদর করে ] আমার পারলিম্পলিনো ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে আমি কোনোদিন চিনতামই না।

পারলিম্পলিন : সেই জন্যেই তো আমার বিশ্বস্ত সোনামণিটাকে সব সময় এমন আগলে আগলে রাখতে চাই। [ দরজাটা বন্ধ করে রহস্যময় ভঙ্গিতে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ] ছাখো, আমি সব বুঝি সবই অনুভব করতে পারি। তুমি যুবতী, আমি বৃদ্ধ। কিন্তু কি করবো বলো! [বিরতি। চাপা স্বরে] আজ কি ও এসেছিলো ?

বেলিসা : হ্যাঁ।

পারলিম্পলিন : ও কি তোমাকে কোনো সংকেত দিয়েছিলো ?

বেলিসা : হ্যাঁ, অথচ এমন ভাবে যা আমার একটুও ভালো লাগেনি।

পারলিম্পলিন : ভয় পেও না। দিন পনেরো আগে আমি সেই তরুণকে প্রথম দেখেছিলাম। ওর রূপ, ওর পৌরুষদীপ্ত সমস্ত অবয়বে লাবণ্য মিশে এমন একটা সৌন্দর্য ফুটে উঠেছিলো, যা আমি অন্য কোনো পুরুষের মধ্যে আর কখনও দেখিনি। তখন জানি না কেন, সবার আগে তোমার কথাই আমার মনে পড়েছিলো।

বেলিসা : ওর মুখ আমি কখনও দেখিনি···অথচ···

পারলিম্পলিন : অথচ কি ? আমাকে তুমি নিঃসঙ্কোচে বলো। আমি জানি তুমি তাকে ভালোবাসো···আর আমি যে তোমাকে ভালোবাসি সে যেন পিতৃস্নেহ।

বেলিসা : ও আমাকে চিঠি লেখে।

পারলিম্পলিন : আমি জানি।

বেলিসা : অথচ আমি ওকে কখনও দেখিনি।

পারলিম্পলিন : সত্যিই ব্যাপারটা অদ্ভুত !

বেলিসা : কখনও কখনও মনে হয় ও বুঝি আমাকে অবজ্ঞাই করে !

পারলিম্পলিন : সত্যিই তুমি কি নিষ্পাপ, বেলিসা !

বেলিসা : অথচ নিঃসন্দেহে জানি ও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে…

পারলিম্পলিন : কেমন করে তুমি জানলে ?

বেলিসা : ওর চিঠি থেকে। যদিও আমি কখনও চিঠির জবাব দিইনি, কেননা আমি জানি আমার ছোট্ট একটা স্বামী আছে—যার বাড়িটা স্বপ্নের মতো সুন্দর আর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত। তবু ওর চিঠিগুলো…

পারলিম্পলিন : বলো না, বলো ; এখানে তো আর কেউ নেই !

বেলিসা : চিঠিতে ও লেখে আমার কথা…আমার শরীরের কথা…

পারলিম্পলিন : [ ওর চুলে হাত বুলিয়ে ] তোমার শরীরের কথা !

বেলিসা : ও বলে, 'তোমার আত্মা আমি চাই না। আত্মা পঙ্গু আর ভীরু মানুষদের জন্যে। শীর্ণ বাহু, শুভ্র কুন্তল কোনো রূপসীর আত্মা শুয়ে থাকবে মৃত্যুর শিয়রে। আত্মা নয়, বেলিসা ; আমি যা চাই তোমার শুভ্র কোমল দেহ।'

পারলিম্পলিন : কে হতে পারে সেই দুরন্ত যৌবন পুরুষ ?

বেলিসা : কেউ জানে না।

পারলিম্পলিন : [ অনুসন্ধিৎসু চোখে ] কেউ না ?

বেলিসা : আমার সমস্ত বন্ধুদের জিগেস করেছি।

পারলিম্পলিন : [ রহস্যময় ভঙ্গিতে ] আর যদি বলি আমি চিনি ?

বেলিসা : তা কেমন করে সম্ভব !

পারলিম্পলিন : একটু দাঁড়াও। [ বারান্দায় গিয়ে ] ওই যে ওখানে !

বেলিসা : [ দৌড়ে ] সত্যি ?

পারলিম্পলিন : এই সবে ওদিকে বেঁকে গেলো।

বেলিসা : [ রুদ্ধশ্বাসে ] ও !

পারলিম্পলিন : যেহেতু আমি বৃদ্ধ, আমি চাই তোমার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে। আমি এমন একটা কিছু করতে চাই যা এর আগে কেউ আর কখনও করেনি। বিদায়।

বেলিসা : কোথায় যাচ্ছো তুমি ?

পারলিম্পলিন : [ দরজার কাছ থেকে ] এখন নয়, পরে সবই জানতে পারবে।

## তৃতীয় দৃশ্য

সাইপ্রেস আর কমলার ঝোপ। পরদা ওঠার পর মার্কোফা আর পারলিম্পলিন বাগানে প্রবেশ করলো।

মার্কোফা : এখনও সময় হয়নি ?

পারলিম্পলিন : না, এখনও সময় হয়নি।

মার্কোফা : কিন্তু তুমি কি ভাবছো আমায় বলো তো ?

পারলিম্পলিন : সবকিছু এখনও আমার ভাবাই হয়ে ওঠেনি।

মার্কোফা : [ কাঁদতে কাঁদতে ] বুঝতে পেরেছি, দোষটা আমারই !

পারলিম্পলিন : আঃ, তুমি যদি জানতে পারতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বুকের ভেতরটা আমার কেমন ভরে উঠেছে !

মার্কোফা : এর আগে সবকিছুই কি সুন্দর কেটে যাচ্ছিলো। ভোরবেলায় আমি তোমাকে কফি, দুধ আর আঙুর দিতাম ···

পারলিম্পলিন : হ্যাঁ, হ্যাঁ···আঙুর···কিন্তু সে তো একশো বছর আগে ! এর আগে পৃথিবীতে যে এমন আশ্চর্য কিছু থাকতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারিনি ! অথচ এ সবকিছুই ছিলো ঠিক দরজার ওপারে। আর আজ, বেলিসার ভালোবাসা আমার হাতে তুলে দিয়েছে এক অনন্য সম্পদ, আগে যা আমি কেবল উপেক্ষাই করেছি। এখন চোখ বন্ধ করলে স্পষ্টই দেখতে পাই আমি কি চাই। ঠিক যেমন, আমার মা যখন আসতেন, সঙ্গে নিয়ে আসতেন ছোট ছোট এলফগুলোকে···এলফগুলোকে তোমার মনে আছে ? ওগুলো এমন ছোট্ট আর সুন্দর, ইচ্ছে করলে আমার আঙুলের ওপরেও নাচতে পারতো।

মার্কোফা : হ্যাঁ, সব মনে আছে। কিন্তু এদিকের ব্যাপারটা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ?

পারলিম্পলিন : এদিকের ব্যাপারটা বেলিসাকে সব ঠিক ঠিক বলেছো তো ?

মার্কোফা : যদিও এসব আমার আদৌ আসে না বাপু, তবু তুমি আমাকে যা যা বলতে বলেছিলে সবই বলেছি—বলেছি আজ রাত ঠিক দশটায় সেই তরুণ বাগানে আসবে, লাল আলখাল্লায় জড়ানো থাকবে তার সর্বাঙ্গ।

পারলিম্পলিন : আর ও কি বললো ?

মার্কোফা : কি আর বলবে, গোলাপের মতো একেবারে লাল হয়ে উঠলো, বিনুনীটা নিয়ে চুমু খেতে লাগলো বারবার।

পারলিম্পলিন : তাহলে গোলাপের মতো লাল হয়ে উঠলো।

মার্কোফা : আর সে কি গভীর দীর্ঘশ্বাস !

পারলিম্পলিন : এমন গভীর দীর্ঘশ্বাস এর আগে কোনো নারী আর কখনও ফেলেনি, তাই না ?

মার্কোফা : ওর ভালোবাসা যেন উন্মত্ততায় জড়ানো।

পারলিম্পলিন : [ স্পন্দিত স্বরে ] ঠিক তাই ! আমি যা চাই—তরুণের চেয়েও দেহাতীত ওকে ভালোবাসতে। যদিও বেলিসা নিঃসন্দেহে ওকে আরও বেশি ভালো বাসে।

মার্কোফা : [কাঁদতে কাঁদতে] তোমার কথা শুনে ভয় হয়। ডন পারলিম্প-লিন, কেমন করে এটা সম্ভব…কেমন করে · তুমি যে নিজেই তোমার স্ত্রীকে উৎসাহিত করেছো নরকের চাইতেও এই কদর্য পাপে ?

পারলিম্পলিন : যেহেতু পারলিম্পলিন হতভাগ্য, ব্যর্থ প্রেমিক ! তুমি তো নিজেই দেখতে পাচ্ছো—এই মুহূর্তে যন্ত্রণা ছাড়া তার আর কিছু নেই। আজ রাতে আমার অনন্য বেলিসার এক অজানা প্রেমিক আসবে ওর কাছে।

মার্কোফা : এই মুহূর্তে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই। দাসী বলে কি আমাদের কোনো লজ্জা নেই ?

পারলিম্পলিন : মার্কোফা, লক্ষ্মীটি শোনো। কালই তুমি মুক্ত হয়ে যাবে ছোট্ট পাখির মতন। শুধু আজ রাতটুকু থেকে যাও। আর যা যা করার কথা বলেছি মনে আছে তো সব ?

মার্কোফা : কি করার আছে, কি করতে পারি আমি নিজেই জানি না !

কাঁদতে কাঁদতে মার্কোফা বিদায় নেয়। এমন সময় নিশিথ প্রেমগীতির একটা মিষ্টি, মিলিত কণ্ঠ শোনা যায়। পারলিম্পলিন গোলাপঝোপের আড়ালে লুকোয়

মিলিত কণ্ঠস্বর : নদীর শুষ্ক সৈকতে
থেমে গিয়েছে রাত্রির অবগাহন।
থেমে গিয়েছে রাত্রির অবগাহন।

আর বেলিসার থমকানো শুনে
অবসন্ন হয়েছে ফুলেদের ভালোবাসা।

পারলিম্পলিন : অবসন্ন হয়েছে ফুলেদের ভালোবাসা!

মিলিত কণ্ঠস্বর : বসন্তের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে
নগ্ন রাত্রি গান গায়।
নগ্ন রাত্রি গান গায়।
সুগন্ধি নির্যাস আর লবণাক্ত জলে
বেলিসাও নগ্নদেহে স্নান করে।
বেলিসাও নগ্নদেহে স্নান করে।

পারলিম্পলিন : অবসন্ন হয়েছে ফুলেদের ভালোবাসা!

মিলিত কণ্ঠস্বর : ঘরের প্রতিটা ছাদে
আশ্চর্য প্রজ্জ্বল মৌরীর রুপোলী রাত্রি।
আশ্চর্য প্রজ্জ্বল মৌরীর রুপোলী রাত্রি।
নদীর স্বচ্ছ আয়নায়
উদ্ভাসিত তোমার উরুর শুভ্র নগ্নতা।
উদ্ভাসিত তোমার উরুর শুভ্র নগ্নতা।

পারলিম্পলিন : অবসন্ন হয়েছে ফুলেদের ভালোবাসা!

আশ্চর্য সুন্দর পোশাকে বেলিসা বাগানে প্রবেশ করলো। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সারা মঞ্চ

বেলিসা : কার আশ্চর্য মিষ্টি কণ্ঠস্বর ভরিয়ে তুললো নিশিথিনীর এই সুগন্ধি বাতাস? আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে অনুভব করতে পারছি তোমার উষ্ণতা, তোমার অনন্য দেহভার। আঃ, শাখায় শাখায় কি উন্মত্ত স্পন্দন···

লাল আলখাল্লায় সর্বাঙ্গ ঢাকা একটা মানুষ সন্তর্পনে বাগানটা অতিক্রম করে গেলো

বেলিসা : আঃ, ওই বুঝি!

মানুষটা হাতের সংকেতে বোঝালো—দাঁড়াও, এখুনি আসছি

হ্যা, ও-ই তো! আঃ, ফিরে এসো, ভালোবাসা আমার! যেন শিকড়বিহীন একটা চামেলি দুলছে বাতাসে আর আকাশ বুঝি এখনই ছিঁড়ে পড়বে আমার কাঁধে। রাত্রি! পুদিনা আর নীলকান্ত মণির গাঢ় রাত্রি আমার···

পারলিম্পলিন : [ ভেতরে প্রবেশ করে, বিস্ময়ে ] একি, এখানে কি করছো ?

বেলিসা : এমনি বেড়াচ্ছি।

পারলিম্পলিন : শুধু তাই, আর কিছু নয় ?

বেলিসা : দেখছো না, কেমন মিষ্টি বাতাস !

পারলিম্পলিন : [ কঠিন স্বরে ] তুমি এখানে কেন এসেছো বেলিসা ?

বেলিসা : [ অবাক হয়ে ] কেন এসেছি তুমি জানো না ?

পারলিম্পলিন : আমি কিছুই জানি না।

বেলিসা : তুমিই তো আমাকে খবর পাঠিয়ে ছিলে।

পারলিম্পলিন : [ তীব্র কামনায় ] বেলিসা…বেলিসা, তুমি এখনও ওর জন্যে অপেক্ষা করছো ?

বেলিসা : হ্যাঁ, তার চাইতেও আরও তীব্র কামনায়।

পারলিম্পলিন : [ রুক্ষস্বরে ] কিন্তু কেন ?

বেলিসা : যেহেতু আমি ওকে ভালোবাসি।

পারলিম্পলিন : বেশ, ও আসবে।

বেলিসা : একটু আগেই পেয়েছিলাম ওর শরীরের স্নিগ্ধ সুবাস। আমি ওকে ভালোবাসি, পারলিম্পলিন। ভীষণ, ভীষণ ভালোবাসি ! মনে হচ্ছে আমি যেন অন্য কোনো নারী !

পারলিম্পলিন : এ আমার বিজয়উল্লাস।

বেলিসা : কিসের বিজয় ?

পারলিম্পলিন : আমার কল্পনার।

বেলিসা : কিন্তু তুমিই আমাকে সাহায্য করেছিলে ওকে ভালোবাসতে।

পারলিম্পলিন : এখন সাহায্য করবো ওর জন্যে বিলাপ করতে।

বেলিসা : [ বিহ্বল স্বরে ] এ তুমি কি বলছো, পারলিম্পলিন ?

ঘড়িতে দশটা বাজলো। শোনা গেলো পাপিয়ার গান

পারলিম্পলিন : দশটা বাজলো।

বেলিসা : এখনই তো ওর আসার কথা।

পারলিম্পলিন : হ্যাঁ, আমার বাগানের প্রাচীর পেরিয়ে ও আসবে।

বেলিসা : ওর সারা দেহ থাকবে আরক্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা।

পারলিম্পলিন : [ একটা ছুরি বের করে ] ওরই গাঢ় রক্তের মতো লাল।

বেলিসা : [ তাকে আঁকড়ে ] এই, এ তুমি কি করছো ?

পারলিম্পলিন : [ আলিঙ্গন করে ] বেলিসা, তুমি ওকে ভালোবাসো ?

বেলিসা : ভীষণ, ভীষণ !

পারলিম্পলিন : বেশ, তুমি যখন ওকে এতই ভালোবাসো, আমি চাই না ও তোমাকে ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাক। বরং ও থাক সম্পূর্ণ তোমার। তাই ভেবেছি, এ ছুরি আমূল বিদ্ধ করে দেবো ওর বুকে। তোমার ভালো লাগবে না ?

বেলিসা : দোহাই তোমার···না, পারলিম্পলিন, না !

পারলিম্পলিন : তারপর, মৃত্যুলীন, শয্যায় তুমি চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দেবে ওর অনিন্দ্য-সুন্দর সারাটা দেহ আর ও-ও নির্ভয়ে ভালোবাসতে পারবে তোমাকে। মৃত্যুর অন্তহীন প্রেমে ও তোমাকে ভালোবাসাবে আর আমি তোমার অনন্ত দেহের দুঃস্বপ্নের গাঢ় অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবো। [ ওকে আদর করতে করতে ] তোমার দেহ, যার রহস্য আমি কোনোদিনও উদ্ধার করতে পারবো না। [ বাগানের দিকে তাকিয়ে ] ওই ও আসছে! আমি যাই !

পারলিম্পলিন ছুটে বেরিয়ে যায়

বেলিসা : [ উন্মত্তের মতো চেঁচিয়ে ] মার্কোফা, খাবার ঘর থেকে শিগগির আমার ছুরিটা দিয়ে যাও ! মনে রেখো পারলিম্পলিন, তুমি যদি ওকে খুন করো, আমিও তোমাকে ছেড়ে দেবো না !

আরক্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা একটা লোক ঝোপের মধ্যে দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। ভীষণ ভাবে আহত, টলছে

বেলিসা : আঃ প্রিয়তম আমার, কে তোমাকে এমন ভাবে আহত করলো ! [ আলিঙ্গন করে ] সারা বাগান ভরিয়ে দেবে বলে কে উন্মুক্ত করে দিলো তোমার প্রতিটা শিরা-উপশিরা। প্রিয়তম আমার, অন্তত একটি বারের জন্যে দেখি তোমার মুখখানা। আঃ, কে, কে তোমাকে এমন ভাবে খুন করলো ?

পারলিম্পলিন : [অবগুণ্ঠন খুলে] তোমার স্বামী এই মাত্র আমাকে খুন করেছে, এই ছাখো চুনী-পান্না বসানো তার ছুরি।

ছুরিটা সে দেখালো, তারপর সম্পূর্ণ বসিয়ে দিলো নিজের বুকে

বেলিসা : [ ভীষণ ভয় পেয়ে ] পারলিম্পলিন !

পারলিম্পলিন : মাঠের মধ্যে দিয়ে সে ছুটে পালিয়ে গেলো, তুমি আর তাকে কোনোদিনও দেখতে পাবে না। আমাকে সে খুন করলো, যেহেতু সে জানতো আমি তোমাকে সত্যিই ভীষণ ভীষণ ভালোবাসতাম। খুন করার সময় সে চিৎকার করে বললো : 'বেলিসা, এখন দেখছি ওর একটা সত্তাও আছে ! আঃ, আমি আর পারছি না, আর একটু কাছে এসো না, লক্ষ্মীটি।

বেঞ্চিতে সে নিজেকে টান টান করে মেলে দিলো

বেলিসা : কিন্তু এসব কেন ? ঈশ্, রক্তে যে সমস্ত ভিজে গেছে।

পারলিম্পলিন : পারলিম্পলিন আমাকে খুন করেছে···আঃ, ডন পারলিম্পলিন। বৃদ্ধ, ভীরু, দুর্বল তুমি · বেলিসার দেহ তোমার জন্যে নয়। বেলিসার দেহ বলিষ্ঠ বাহু আর উষ্ণ ঠোঁটের প্রতীক্ষায় উন্মুখ। আর অন্যদিকে আমি কেবল ভালো বেসেছিলাম তোমার দেহকেই। অথচ অতর্কিতে সে-ই খুন করলো আমাকে।

বেলিসা : কেন, তুমি কি করেছিলে ?

পারলিম্পলিন : তুমি কিছু বুঝতে পারছো না ? আমি আমার হৃদয় আর তুমি তোমার দেহ। তুমি তো আমাকে ভীষণ ভালো বেসেছিলে, তা-হলে শেষবেলায় আমাকে তোমার কোলে একটু মাথা রেখে মরতে দাও।

বিধ্বস্ত বেলিসা তাকে বুকের কাছে টেনে নিলো

বেলিসা : কিন্তু কোথায় সেই তরুণ ? কেন তুমি আমার সঙ্গে এমন ছলনা করলে ?

পারলিম্পলিন : তুমি সেই তরুণকে খুঁজে পাচ্ছো না, বেলিসা ?

পারলিম্পলিন চোখ বন্ধ করলো। জাদুকরী এক আলোয় ভরে উঠলো সারা মঞ্চ। মার্কোফা প্রবেশ করলো।

মার্কোফা : মাদাম···

বেলিসা : [ কাঁদতে কাঁদতে ] ডন পারলিম্পলিন মারা গেছে !

মার্কোফা : জানতাম ! এ আমি জানতাম। এখন ওর মৃতদেহ সাজিয়ে দিতে হবে যৌবনের আরক্ত পোশাকে, যাতে ও স্বচ্ছন্দে হেঁটে যেতে পারে নিজেরই ঝুলনো বারান্দার নিচে দিয়ে।

বেলিসা : ও এমন ছলনা করবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

মার্কোফা : বুঝলে অনেক দেরিতে। এখন আমাকে ওর মাথায় পরিয়ে দিতে হবে দুপুরের উত্তপ্ত সূর্যের মতো ফুলের মুকুট।

বেলিসা : [বিহ্বলের মতো, যেন অন্য কোনো পৃথিবী থেকে] পারলিম্পলিন, এ তুমি কি করলে ?

মার্কোফা : বেলিসা এখন তুমি অন্য কোনো নারী। আমার প্রভুর রক্তে ভিজে গেছে তোমার উজ্জ্বল পোশাক।

বেলিসা : কিন্তু ওই লোকটা কে ? সেই তরুণ ?

মার্কোফা : উদ্ভিন্ন যৌবনসে, যার মুখ তুমি আর কোনোদিনও দেখতে পাবে না।

বেলিসা : কিন্তু মার্কোফা, আমি তাকে ভালোবাসি···আমার হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে ভালোবাসি ! কোথায় আরক্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা সেই আশ্চর্য তরুণ ? কোথায় ? কোথায় ?

মার্কোফা : ডন পারলিম্পলিন, তুমি এখন নীলিম শান্তিতে ঘুমোও··· শুনতে পাচ্ছো ? ডন পারলিম্পলিন, তুমি এখন নীলিম শান্তিতে ঘুমোও তোমার নিবিড় ভালোবাসায়।

শোনা গেলো ঘণ্টাধ্বনি।

অনুবাদ / অসিত সরকার